Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

স্বপ্না খাতুন

রোলঃ 227020915

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

স্বপ্না খাতুন

রোলঃ 227020915

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে স্বপ্না খাতুন, আইডিঃ 227020915 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shopna Khatun

(স্বাক্ষর)

স্বপ্না খাতুন

আইডিঃ 227020915

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আমাদেরকে তাঁর বান্দা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে কবুল করেছেন এবং আমাদেরকে দান করেছেন পরিপূর্ণ দ্বীন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবী, রাসূলুল্লাহ, হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, যিনি বিশ্ববাসীর প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। আরও সালাম বর্ষিত হোক তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লহু আনহুম আজমাইনগণের ওপর।
ফিলিস্তিন পবিত্র ভূমি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই ভূমিকে পবিত্র ও এর চারপাশকে বরকতময় বলে অভিহিত করেছেন।

ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত বাইতুল মাকদিস বা মাসজিদুল আকসা মুসলমানদের প্রথম কিবলা, মক্কা-মদীনার পর তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। মাসজিদুল হারামের পূর্বে মুসলিমরা মাসজিদুল আকসার দিকে ফিরে সালাত আদায় করতেন। মক্কা মুকাররমার মাসজিদুল হারাম ও মদীনা মুনাওয়ারার মাসজিদুন নববীর পর শুধু এই মাসজিদুল আকসার দিকেই সওয়াব ও বরকতের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়। এখানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের সফরে সকল নবী-রাসূলগণের ইমামতি করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মিরাজের স্মৃতিসহ অসংখ্য নবী-রাসূলগণের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি এই ফিলিস্তিন। দীর্ঘকাল এখানে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে এর অনেক ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে অনেক নবীগণ এখানে বসবাস করেছেন। এই ভূমিতে এবং এর আশেপাশে সমাহিত হয়েছেন তারা। এই ভূমিতে শাসন করেছেন সাহাবীরা, বীর মুজাহিদ সালাহউদ্দীন আইয়ুবী সহ অন্যান্য মুসলিম শাসকেরা। এই পবিত্র ভূমিতেই সংঘটিত হবে মালহামাতুল কুবরা।

বাইতুল মাকদিস আমাদের সম্মানিত ঐতিহ্য। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে দিয়েছেন। যেদিন থেকে সাহাবীরা বাইতুল মাকদিস বিজয় করেছিলেন, সেদিন থেকেই এই আমানত রক্ষা করা আমাদের জন্য ঈমানের দাবিতে পরিণত হয়েছে। বাইতুল মাকদিসের যথাযথ সংরক্ষণের মাঝেই মুসলিম উম্মাহর উন্নতির স্থায়িত্বের মূলমন্ত্র নিহিত।

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমি

وَ نَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَي الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ

আমি তাকে(ইবরাহীম আ.) ও লূতকে উদ্ধার করে এমন এক ভূমিতে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছি।
(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৭১)

ফিলিস্তিন পৃথিবীর এমন ভূখণ্ড, যা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মহান আল্লাহ এ ভূখণ্ডকে প্রাকৃতিক পদার্থে ভরপুর করার পাশাপাশি ঐশী বিভিন্ন মর্যাদার অধিকারী করেছেন। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এই ভূমিকে বরকতময় বলে উল্লেখ করেছেন। নবী-রাসূলদের পদচারণা এই ভূমিকে করেছে গৌরবময়। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ বিভিন্ন বীরের বিজয়গাথা এ ভূমিতেই রচিত হয়েছিল। এ পবিত্র ভূমি ঐতিহাসিক এত উত্থান-পতনের সাক্ষী হয়েছিল, যা অন্য কোনো ভূমির বেলায় ঘটেনি।

ফিলিস্তিন ভৌগোলিকভাবে খুবই ছোট একটি ভূমি তবে এর রয়েছে সবচেয়ে প্রাচীন ইতিহাস। এর ইতিহাস নবীদের ধারাবাহিকতা দিয়ে শুরু হয়। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিলিস্তিনে কানআনী, ফিনিশিয়ান, আমোরীয়দের আগমন হয়েছিল।

ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাচীন সভ্যতা

১. ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থান ও এর গুরুত্ব

ভৌগোলিক দিক থেকে ফিলিস্তিন মধ্যপ্রাচ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। ফিলিস্তিনের পূর্বে রয়েছে লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান ও সৌদি আরব। পশ্চিমে আফ্রিকার আরব দেশ মিসর। এই পুরো অঞ্চল হলো তেলসমৃদ্ধ। আর উত্তর-পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, যার তীরে সাইপ্রাস, তুরস্ক, গ্রিসসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহ অবস্থিত। ইউরোপ থেকে সড়কপথে আফ্রিকা যেতে হলে ফিলিস্তিনের উপর দিয়েই যেতে হবে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের সাথে সংযুক্ত এই দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। এটাই ফিলিস্তিনের ভৌগোলিক অবস্থানের একমাত্র সুবিধা নয় বরং আরও সুবিধা আছে। ফিলিস্তিন একসঙ্গে ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত। ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অংশ 'গালফ অব আকাবা' বা আকাবা উপসাগরের সাথে সংযুক্ত। আকাবা উপসাগরের এক পাশে সৌদি আরব। অন্য পাশে মিসরের সিনাই উপত্যকা, যা সুয়েজ খাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যিক জাহাজগুলো প্রথমে লোহিত সাগরে আসে তারপর সুয়েজ খাল পার হয়ে ভূমধ্যসাগরে যায়। ইউরোপ ও এশিয়ার বাণিজ্যের মেরদ- সুয়েজ খাল ফিলিস্তিন থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে। সে হিসেবে সুয়েজ খালে নজর রাখা কিংবা সুয়েজ খাল বন্ধ করে দেওয়ার জন্য সাইপ্রাসের চেয়েও উত্তম জায়গা হলো ফিলিস্তিন। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আর জর্ডান নদী ফিলিস্তিনের পূর্ব দিকে অবস্থিত, যা ফিলিস্তিন ও জর্ডানের সীমান্তও। জর্ডান নদী গোলান পর্বতমালা থেকে শুরু হয়ে সি অফ গ্যালিলিতে গিয়ে পড়ে, তারপর সেখান থেকে মৃত সাগর প্রবাহিত হয়। সি অফ গ্যালিলি পানযোগ্য পানির অনেক বড় উৎস। পশ্চিম তীরের সঙ্গে অবস্থিত ফিলিস্তিনের উপকূলীয় এলাকা শ্যারেন প্লেন। এই এলাকাও চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী। পশ্চিম তীরে রয়েছে জেরুজালেম শহর। যাতে তিনটি ধর্মের পবিত্র স্থান রয়েছে।

২. ফিলিস্তিনের প্রাচীন সভ্যতা

ফিলিস্তিন প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র। এখানে যুগে যুগে বিভিন্ন জাতি ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে।

ফিলিস্তিনে বসবাসকারী প্রথম জনগোষ্ঠী ছিল কানআনী আরবরা। এ জাতির প্রতিটি শাখা আরব বংশোদ্ভুত। জাযিরাতুল আরব থেকে তারা ফিলিস্তিনে অভিবাসন গ্রহণ করেছিল। তারা ছিল মূর্তিপূজারি। তারা আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। নাবলুস, বাইসান, আক্কা, আসকালান, হাইফাসহ দুই শতাধিক শহর তারা গড়ে তুলেছিল। ইহুদীদের ফিলিস্তিন প্রবেশের ১৪০০ বছর পূর্বে তারা আগমন করে। তারা কৃষি, পশুপালন এবং ব্যবসায় পারদর্শী ছিল।

ফিলিস্তিনের ভূমিতে বসবাসকারী আরও একটি সম্প্রদায় হল ফিনিশিয়ান সম্প্রদায়। অবশ্য ফিনিশিয়ানরা আরব কেনআনীদেরই একটি শাখা। প্রাচীনকালে তারা সিরিয়ার নিকটবর্তী উত্তর ফিলিস্তিনীয় অঞ্চলে বসবাস করত। ইতিহাসখ্যাত সেই প্রসিদ্ধ ফিনিশিয়ান সভ্যতা তাদেরই অবদান।

আমোরীয়রা ফিলিস্তিনে বসবাসকারী আরেকটি সম্প্রদায়। তাদের থেকেই এসেছে হিক্সস সম্প্রদায়। যারা পরবর্তীতে মিসর, ফিলিস্তিন ও শামের বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। আল-কুদসের গোড়াপত্তন তাদের অন্যতম কীর্তি। তারা এ শহরের নাম দিয়েছিল উরসালিম।

এর কয়েকশ বছর পর ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে ব্লেস্ট জনগোষ্ঠী। তারা এসেছিল ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ক্রিট থেকে। এরাও ইহুদী ছিল না। এ ব্লেস্ট গোত্রই বর্তমান ফিলিস্তিনকে প্যালেস্টাইন (Palestine) নাম দেয়।

নবী-রাসূলগণের অবস্থান

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইরাকের বসরার 'বাবেল' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তার সম্প্রদায় মূর্তিপূজা করত। তার পিতাও ছিলেন একজন মূর্তিপূজক। কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং একনিষ্ঠ মুসলিম। কুরআনে এসম্পর্কে বলা হয়েছে,

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ৬৭)

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন তবে তার সম্প্রদায় কখনো তার দাওয়াত কবুল করেনি। তাওহীদের বাণী প্রচার করতে গিয়ে স্বভাবতই তিনি সেখানের রাজার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। তার পুরো জীবন কেটেছে পরীক্ষা ও কষ্ট-মুসিবতে। তাকে আগুনেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাওহীদের বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি আল্লাহর আদেশে ইরাক থেকে হিজরত করে শামে চলে যান।

২০০০ খ্রিষ্টপূর্বে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। এই ধাপটি ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগেই এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে প্রথম তাওহীদের প্রকাশ ঘটে। যখন তিনি ইরাক থেকে হিজরত করে ফিলিস্তিনে আসেন তখন ছিল হিক্সসদের শাসনামল। তারা মূর্তিপূজারি হলেও ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ দেয়। এখানেই হযরত ইসমাঈল আ.-এর জন্ম। এ হিসেবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ফিলিস্তিনের শেকড়ের সম্পর্ক। আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কায় রেখে আসেন। এরপর ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। ইসহাক আলাইহিস সালাম এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াকুব আলাইহিস। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে তিনি বেশ তাৎপর্যের অধিকারী। একসময় তিনি হিজরত করে বর্তমান তুরস্কের দক্ষিণ অঞ্চল হাররানে চলে যান। পরবর্তীতে আবার ফিলিস্তিনে হিজরত করেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আরেক নাম ছিল ইসরাইল। হিব্রুতে ইসরাইল মানে আবদুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের **১২** জন পুত্র ছিল। এই **১২** জন পুত্র ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বনী ইসরাইল বলা হয়ে থাকে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের সময় বনী ইসরাইল মিশরে যায়। সেসময় মিশরের শাসন ক্ষমতায় ছিল ভিনদেশি হিক্সস জাতি। তারা ১৭২০ খ্রিষ্টপূর্বে মিশরের শাসনক্ষমতা দখল করে। যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল ততদিন বনী ইসরাইল মোটামুটি সম্মানের সাথেই মিশরে অবস্থান করেছে। এরপর মিশরীয়রা ১৫৬০ খ্রিষ্টপূর্বের দিকে ভিনদেশি হিক্সস জাতিকে দূর করে নিজেরা শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এই সময়ে মিশরের রাজাদেরকে বলা হতো ফিরআউন। ফিরআউন তথা মিশরীয়রা বনী ইসরাইলকে মনে করত হিক্সসদের সহযোগী। এ সময় বনী ইসরাইলের সাথে দাস-দাসির মতো আচরণ করা হতো, বনী ইসরাইলের ওপর নেমে আসে প্রচণ্ড জুলুম-নির্যাতন। এ নির্মমতা চলে ৩ শ বছর পর্যন্ত। এই সময়ে বনী ইসরাইলের স্বভাব-চরিত্রে ব্যাপক ধস নামে, যেসব স্বভাব-চরিত্রে বর্তমানে আমরা তাদের চিনি। ভয়, লাঞ্ছনা, মিথ্যা তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। একপর্যায়ে তারা তাওহীদ ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়।

মুসা আলাইহিস সালাম

ফিরআউন তখন বনী ইসরাইলের শাসক। তার অত্যাচারে রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ। সাম্রাজ্য বাঁচাতে ফিরআউন যখন হত্যা করছিল বনী ইসরাইলের নবজাতক পুত্র সন্তানদেরকে তখন মহান আল্লাহ শিশু মূসার জন্মের পর তাকে বাঁচানোর জন্য এই পরিকল্পনা করলেন যে, মূসাকে স্বয়ং ফিরআউনের রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে তার তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনের প্রাসাদেই বড় হতে থাকলেন। এক সময় তিনি মাদইয়ানে চলে যান এবং সেখান থেকে মিশরে ফেরার পথে সিনাই পর্বতে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তার সাথে তার ভাই হারুন আলাইহিস সালামও নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। তারপর ফিরআউনের প্রাসাদে গিয়ে তারা ফিরআউনকে তাওহীদের দাওয়াত দেন এবং বলেন বনী ইসরাইলকে তাদের সাথে যেতে দিতে, তাদেরকে নির্যাতন না করতে। কিন্তু ফিরআউন তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশে বনী ইসরাইলকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েন এবং আল্লাহর অনুগ্রহে বনী ইসরাইল ফিরআউনের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে।

মূসা আলাইহিস সালাম তার কাফেলা নিয়ে মিশর ত্যাগ করে ফিলিস্তিনের সীমান্তে পৌঁছেন। সে সময় বায়তুল মুকাদ্দাসে আমালেকাদের শাসন ছিল, যারা এক বীর-বাহাদুর গোত্র রূপে পরিচিত ছিল। যখন মূসা আলাইহিস সালাম পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে বসবাস করার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন তার জন্য ক্ষমতাসীন আমালেকাদের বিরুদ্ধে জিহাদ জরুরী ছিল। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম নিজ গোত্রকে ঐ পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন এবং সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্যের সুসংবাদও শোনালেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বনী ইসরাইল আমালেকাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল না।

বনী ইসরাইলের সাথে মূসা আলাইহিস সালামের কথপোকথন কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰي لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ

‘যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহকে স্মরণ করো যখন তিনি তোমাদের মধ্যে আম্বিয়া সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দান করেননি।’(সূরা মায়িদাহ, আয়াত:২০)

এখানে 'যখন তিনি তোমাদের মধ্যে আম্বিয়া সৃষ্টি করেছেন' আম্বিয়া দ্বারা ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও মূসা আলাইহিস সালাম উদ্দেশ্য। তারা ছিলেন বনী ইসরাইলের বংশধর।

'তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন' বলতে এখানে মূলত একটি ভবিষ্যৎ বাণী বোঝানো হয়েছে যে হজরত তালুত, হজরত দাউদ ও হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের মতো মহান বাদশাহরা তোমাদের মাঝে আসবেন।

পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে,

يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓي اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ
قَالُوْا يٰمُوْسٰٓي اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰي يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ
قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَي اللهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

'হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না, তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে'। তারা বলল, 'হে মূসা, নিশ্চয় সেখানে রয়েছে এক শক্তিশালী জাতি এবং আমরা কখনো সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রবেশ করব'। তাদের মধ্যে দু'জন যারা আল্লাহকে ভয় করত, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন, তারা বলল, 'তোমরা তাদের ওপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ করো। অতঃপর যখন তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপরই নির্ভর করো যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।' (সূরা মায়িদাহ, আয়াত:২১-২৩)

এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল বলছেন যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য নির্ধারিত। অতএব তোমরা এতে প্রবেশ করো। এর উদ্দেশ্য, ঐ বিজয় ও সাহায্য; যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ জিহাদের শর্তে দিয়ে রেখেছিলেন।

কিন্তু বনী ইসরাইলরা আমালেকাদের বীরত্ব-প্রসিদ্ধির কারণে তাদের ভয়ে ভীতু হয়ে যায় এবং প্রথম ধাপেই শক্তি ও সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে যায়। তারা সেখানে যেতে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসলো। তারা কিছুতেই জিহাদ করতে রাজি হলো না বরং তারা জবাব দিলো,

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓي اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ۝

তারা বলল, ‘হে মূসা, আমরা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। সুতরাং, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসলাম’। (আয়াত:২৪)

যখন তারা কোনোভাবেই যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো না তখন মূসা আলাইহিস সালাম বললেন,

قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

মূসা বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার ও আমার নিজের ভাই ব্যতীত অন্য কারো ওপর ক্ষমতা রাখি না, সুতরাং আপনি আমাদের ও এ ফাসিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন।’ (আয়াত:২৫)

অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۚ يَتِيْهُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۗ فَلَا تَاْسَ عَلَي الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

আল্লাহ বললেন, ‘এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য করা হলো। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সুতরাং আপনি ফাসিক সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।’ (আয়াত:২৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বনী ইসরাইলকে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের কাপুরুষতা দেখানোর ফলে এই পবিত্র ভূমি তাদের জন্য হারাম করে দেন। ৪০ বছর তারা এতে প্রবেশ করতে পারবে না, এই সময়টা তারা উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে। এর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মূসা আলাইহিস সালামকে দুঃখ করতে নিষেধ করে দেন।

এই সময়ে বনী ইসরাইল মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, তারা শিরকের মতো কর্মকাণ্ডে জড়িতে নানা অপকর্ম শুরু করেছিল। মরুভূমিতে বনী ইসরাইলের ওপর ৪০ বছর এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায়। এই সময় মূসা আলাইহিস সালাম ও হারুন আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। মূসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় বনী ইসরাইল পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেনি।

ইউশা বিন নুন আলাইহিস সালাম

মূসা আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর বনী ইসরাইলের যে প্রজন্ম মিশরে ক্রীতদাস ছিল তাদের অধিকাংশই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। নতুন প্রজন্মের যে তরুণদের আবির্ভাব হয়েছে তারা মরুভূমির শুষ্ক ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় জন্ম নিয়েছে এবং বেড়ে উঠেছে। মরুভূমির জীবন খুবই কঠিন, তাই এই কষ্টকর জীবনে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছিল দৃঢ় সংকল্প, সাহস ও উদ্যমী মনোভাব। এই প্রজন্ম মূসা আলাইহিস সালামের উত্তরসূরি হজরত ইউশা বিন নুনের নেতৃত্বে ফিলিস্তিন আক্রমণ করে আরিহা শহর জয় করে। তিনি তাদেরকে নিয়ে ফিলিস্তিনে বসবাস করতে থাকেন। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার জীবদ্দশায়ই বনী ইসরাইল অনেক বিশৃঙ্খলা করে।

বনী ইসরাইল তাদের ১২ টি গোত্রের মধ্যে ১০টি ছোট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরা নিজেরাই একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকে। নিজেদের মাঝে বিভক্তি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে এই পর্যায়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদের ওপর বহিঃশত্রুদের শক্তিশালী করে দেন। আশেপাশের মুশরিক জাতিগুলো এতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তারা পুরো ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। তারা এসে বনী ইসরাইলকে পবিত্র ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে তারা ছন্নছাড়া জীবনযাপন করতে থাকে। এই পর্যায়ে এসে তারা বুঝতে পারে তাদের জিহাদ করা উচিত। এজন্য তারা তৎকালীন নবীকে বলেছিল আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন যেন আমরা তার নেতৃত্বে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তিনি হজরত তালুতকে নিযুক্ত করে দেন। হজরত তালুতের নেতৃত্বে বনী ইসরাইলকে জালুতের বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধে দাউদ আলাইহিস সালাম জালুতের চোখে একটি পাথর দিয়ে আঘাত করেছিলেন, এতে সে মারা যায়।

এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে তাদের ইতিহাসে এক স্বর্ণালি অধ্যায়ের সূচনা হয়। যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তারা জেরুজালেমে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। প্রথমে বাদশাহ হলেন হজরত তালুত, তার মৃত্যুর পর বাদশাহ হিসেবে নিযুক্ত হন দাউদ আলাইহিস সালাম।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দাউদ আলাইহিস সালামকে যাবুর নামক আসমানী কিতাব দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই শ্রুতিমধুর কণ্ঠের অধিকারী। তার তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হতো পশুপাখিরাও। তার ছিল ন্যায়বিচার করার দক্ষতা। দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন একজন বিখ্যাত যোদ্ধা। খ্রিস্টপূর্ব ১০০৪ ঈসাব্দে দাউদ আলাইহিস সালাম আলকুদস শহরে প্রবেশ করেন। তিনি সবচেয়ে বড় ইহুদী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তার সময়ে শুধু জেরুজালেম নয়, এর আশেপাশের অনেক এলাকাও বনী ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে আসে। তা ছিল ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ৭৪% অঞ্চল। এটাই ছিল ফিলিস্তিনে ঈমান ও আহলে ঈমানের প্রথম আধিপত্য। তিনি প্রায় ৪০ বছর শাসনের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার পুত্র সুলাইমান আলাইহিস সালাম।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম

সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর শাসনকাল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুলাইমান আলাইহিস সালামকে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যা অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাকে অর্ধ পৃথিবীর রাজত্ব দান করেছিলেন। তিনি পশুপাখির ভাষা বুঝতেন, জ্বিনদের ওপর তাকে নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা হয়েছিল। তিনিও তার পিতার মতো ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত ছিলেন। দাউদ আলাইহিস সালামের ইন্তেকালের পর সুলাইমান আলাইহিস সালাম উত্তরাধিকারী হন। তিনি দাপটের সঙ্গে শাসন করেন। তাঁর প্রভাবের সামনে বনী ইসরাইল মাথা নুইয়ে রাখলেও তাঁর ইন্তেকালের পরপরই ইহুদীরা পুরোনো চরিত্রে ফিরে যায়। সুলাইমান আলাইহিস সালামও ৪০ বছর শাসন করেন। তিনি বাইতুল মাকদিস পুনঃনির্মাণ করেন।

বনী ইসরাইলের ১২টি গোত্র ছিল। সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর এই রাজ্য তার দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। ১০টি গোত্র নিয়ে গঠিত উত্তরের অংশকে বলা হতো 'ইসরাইল' এবং ২টি গোত্র নিয়ে দক্ষিণের অংশকে বলা হতো ইয়াহুদীয়া বা জুডাহ। উত্তর রাজ্যের রাজধানী ছিল 'সামারিয়া' এবং দক্ষিণ রাজ্যের রাজধানী ছিল 'জেরুজালেম'। দুই রাজ্যের মধ্যেই ছিল পারস্পরিক লড়াই বিদ্বেষ। ৭২২ খ্রিষ্টপূর্বে আসিরীয়রা ইসরাইলের উত্তর অংশে আক্রমণ করে তাদেরকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বাকি থাকে দক্ষিণের জুডাহ

রাজ্য, তাদের মধ্যেও পাপাচার বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদনেজার জুডাহ আক্রমণ করে জেরুজালেমকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, সুলাইমান আলাইহিস সালামের নির্মিত মসজিদটি এমনভাবে ভেঙে দেয় যে এর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল না। লক্ষ লক্ষ ইহুদী পুরুষ, নারী ও শিশুকে বন্দী করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, দীর্ঘ সময় ফিলিস্তিন ইহুদী বিহীন ছিল। এই যুগকে বলা হয়ে থাকে 'বন্দিত্বের যুগ' (Era of Captivity)।

এরপর সাইরাসের নেতৃত্বে পারসিকরা ব্যাবিলনকে পরাজিত করলে ইহুদীরা আবার ফিলিস্তিনে ফিরে যেতে পারে। ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনের পর উযাইর আলাইহিস সালাম সেখানে সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই সংস্কারের মাধ্যমে ইসরায়েলিদের শুদ্ধীকরণ করা হয় এবং তারা শিরক থেকে মুক্ত হয়। এরপর তারা সুলাইমানী মন্দির পুনর্নির্মাণ করে। ঐতিহাসিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় '2nd Temple' অর্থাৎ 'দ্বিতীয় মন্দির'।

পরবর্তীতে আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট ফিলিস্তিন জয়েন করে। তারপর মাকাবিয়ান বিপ্লব ঘটে, যা ইহুদিদের স্বল্পমেয়াদী স্বাধীনতা এনে দেয়। তবে খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ সালে রোমানরা ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। এসময় ফিলিস্তিন রোমান সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে পরিণত হয়। রোমান শাসনের সময়েই ঈসা আ.-এর আগমন ঘটে।

ঈসা আলাইহিস সালাম

ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন বনী ইসরাইল বংশের সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে আসমানী কিতাব দান করেছিলেন। তার জন্ম হয় বাইতুল লাহম বা বেথলেহেম শহরে, যা ফিলিস্তিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঈসা আলাইহিস সালাম এমন এক কঠিন সময়ে ফিলিস্তিনে আগমন করেন, যখন রোমান শাসন ও ইহুদী ধর্মযাজকদের অন্যায় অত্যাচার সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ঈসা আলাইহিস সালাম নিয়মিত বাইতুল মাকদিসে যাতায়াত করতেন এবং জনগণকে তাওহীদের শিক্ষা দিতেন। এতে ইহুদি ধর্মযাজকেরা তাকে তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্বের পথে বাধা মনে করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের ষড়যন্ত্রের এক পর্যায়ে রোমান শাসক তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

'অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল।' (সূরা নিসা, আয়াত:১৫৭)

রোমানরা ইহুদীদেরকে ঈসা আলাইহিস সালাম এর হত্যার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে দায়ী করে এবং তাদের ওপর কঠোর আচরণ শুরু করে। ফলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে একের পর এক বিদ্রোহ করে।

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পর থেকে ৩০০ বছর পর্যন্ত ফিলিস্তিনে অল্প কিছু মানুষই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। তার মা আগেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে গোটা রোমান সাম্রাজ্যেই খ্রিষ্টধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। পৌত্তলিকরাও দলে দলে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাদের চিন্তা-চেতনার প্রভাব খ্রিষ্টধর্মেও পড়ে। যার ফলে খ্রিষ্টধর্ম এক বিকৃত রূপ নিয়ে গোটা রোমান সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এসময় রোমানরা মসজিদে আকসার কাছেও যায়নি। ফিলিস্তিনে রোমান শাসন একেবারে মুসলমানদের ফিলিস্তিন বিজয়ের আগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসলমানদের কাছে ফিলিস্তিনের গুরুত্ব

পৃথিবীর বরকতময় ও স্মৃতিবিজড়িত ফিলিস্তিনের সুন্দর সুশোভিত প্রাচীনতম জেরুজালেম শহরে অবস্থিত মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ আল-কুদস, মাসজিদুল আকসা বা বায়তুল মাকদিস কিংবা বাইতুল মুকাদ্দাস। মুসলিম জাতির প্রথম কিবলা পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনে হওয়ায় তা পৃথিবীর বুকে অবস্থিত সব জাতি-বর্ণের মুসলমানদের প্রাণস্পন্দন। ফিলিস্তিন সেই পবিত্র ভূমি যেখানে নবীগণ একত্রিত হয়েছিলেন। এটি সেই ভূমি যেখানে ইমামুল আম্বিয়া, সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামতি করেছিলেন। এটি সেই ভূমি যাকে কুরআনে পবিত্র ও বরকতময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সেই ভূমি যার কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সেই ভূমি যা উমার ইবনুল খাত্তাব রা. বিজয় করেছিলেন। এটি সেই ভূমি যা মুক্ত করেছিলেন সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। এই ভূমিতেই সংঘটিত হবে মালহামাতুল কুবরা। এই ভূমির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক আত্মার।

বাইতুল মাকদিস

এক নজরে বায়তুল মাকদিসের ইতিহাস

- খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৩০০ অব্দে কেনানিরা বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেছিল।
- খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫০ অব্দে ইবরাহিম আ. এখানে এসেছিলেন এবং এখানের শাসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।
- খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭ থেকে ৯৩১ অব্দ পর্যন্ত এখানে সুলায়মান আ.-এর শাসন ছিল।
- খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭ অব্দে বুখতে নাসরের (নেবুচাদ নেজার) হাতে বায়তুল মাকদিসের পতন ঘটে এবং ইহুদীরা বন্দি হয়।

- খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫ অব্দে রোমের শাসক হাদরিয়ান এ অঞ্চল থেকে ইয়াহুদিদের বহিষ্কার করে।

- ৪০০ থেকে ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ফিলিস্তিন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- ১৫ হিজরি-৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমরা এ এলাকাগুলো স্বাধীন করেছিলেন।

- ১৮ হিজরি-৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ৩ হাজার সাহাবি সম্পূর্ণ শহর বিজয় করেছিলেন এবং এখানের পাদরি সোফ্রোনিয়াস (Sophronius) শহরের চাবি উমর ইবনুল খাত্তাবের হাতে তুলে দিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে।

- ৪৯৩ হিজরি-১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টানরা বায়তুল মাকদিস দখল করে।

- ৫৮৩ হিজরি-১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হিত্তিনের যুদ্ধে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি খ্রিষ্টানদের পরাজিত করে বায়তুল মাকদিস স্বাধীন করেন।

- ৬৫৮ হিজরি-১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে আইনে জালুত যুদ্ধে ফিলিস্তিনকে তাতারদের হাত থেকে মুক্ত করা হয়।

- ৯৩৪ হিজরি-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে বায়তুল মাকদিসকে উসমানি খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

- ১৩৩৬ হিজরি-১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় এবং এর পরে উসমানি খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে। এতে বায়তুল মাকদিস ব্রিটেনের উপনিবেশে পরিণত হয়।

- ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্যালফোর ঘোষণার আওতায় এখানে ইয়াহুদি সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

- ১৩৬৮ হিজরি-১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের ৭৮ শতাংশে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়।

- ১৩৮৭ হিজরি-১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের বাকি অংশও ইয়াহুদিরা দখল করে নেয়।

- ১৪০৮ হিজরি-১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়।

বাইতুল মাকদিসের সূচনা ও স্থাপত্যসমূহ

সহিহ বুখারিতে আবু জার রা.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'কাবা ও মসজিদে আকসার নির্মাণের ব্যবধানকাল হচ্ছে ৪০ বছর।'

বায়তুল্লাহর নির্মাণ আদম আ.-এর হাতে সম্পন্ন হয়েছিল।

আধুনিক গবেষকরা হজরত আদম আলাইহিস সালামকে এই মসজিদের প্রথম নির্মাতা বলে মতামত দিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবনে ধ্বংস হওয়ার পরে হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তার বংশধররা এই মসজিদের পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করেন। কালের পরিক্রমায় হজরত মূসা আলাইহিস সালাম সহ অনেক নবী এই মসজিদের সংস্কার কাজ করেন।
কেনআনি ও জিবুতিদের সময় থেকেই মসজিদের কাঠামো নির্মাণ শুরু হয়। হজরত দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিস সালামের সময় পর্যন্ত অনেক সংযোজনের মধ্য দিয়ে মসজিদুল আকসা বিস্তৃত কম্পাউন্ডে রূপান্তরিত হয়। সুলাইমান আ.-এর পরেও কয়েকবার এখানে মসজিদকে পুনঃনির্মাণ করা হয়। কখনো ভূমিকম্প, কখনো বহিঃশত্রুর আক্রমণে মূল ভবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ার পরে নতুনভাবে মসজিদটিকে পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। যে পুনঃনির্মাণ কখনো ইহুদীদের শত্রু খ্রিষ্টানদের হাতে সম্পন্ন হয়েছিল আবার কখনো মুসলিমদের হাত ধরে নতুন কাঠামো নির্মিত হয়।

পবিত্র ভূমিতে নির্মিত মসজিদের মূল স্থাপনাটির আয়তন ৪২ হাজার বর্গ গজ। মসজিদের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ করে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের স্তম্ভগুলো মূল্যবান মার্বেল পাথর এবং মিহরাব ও গম্বুজের ভেতরের অংশ অত্যন্ত কারুকার্যখচিত টালির মাধ্যমে করা হয়েছে। মসজিদের চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে। উমাইয়া শাসনামলে মসজিদটি যে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানেও সেই ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

মসজিদে আকসা বলতে যদিও পাঁচিলঘেরা পূর্ণ অঞ্চলকেই বোঝানো হয় কিন্তু কখনো শুধু এই বিশেষ মসজিদটিকেও মসজিদে আকসা নামে অভিহিত করা হয়। এই পাঁচিল দিয়ে প্রবেশের

মোট ১৪টি দরজা ছিল পরবর্তীতে নিরাপত্তাজনিত কারণে চারটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত ১০টি দরজাই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মসজিদের বাইরে বড় প্রশস্ত আঙিনা রয়েছে। আঙিনায় মোট সাতটি দরজা আছে। বারান্দার বাইরে বিস্তৃত মাঠে ছোট ছোট স্থাপনা, পানির ফোয়ারা এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার স্মারক হিসেবে নির্মিত ছোট ছোট গম্বুজও আছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় স্থাপনা হলো পাথরের ওপর নির্মিত সেই কারুকার্যবিশিষ্ট গম্বুজযুক্ত স্থাপনা যাকে বলা হয় কুব্বাতুস সাখরা। কুব্বাতুস সাখরা ছাড়াও আল আকসা কমপ্লেক্সে ছোট বড় আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে পরবর্তী মুসলিম শাসনামলে। তার মধ্যে অন্যতম হলো কিবলি মসজিদ, মারওয়ানি মসজিদ, বুরাক মসজিদ। এই মসজিদগুলোর বিভিন্ন মিহরাব, মিম্বার ইত্যাদির সমন্বিত পরিচয় আল আকসা।

পবিত্র ভূমির স্মৃতিবিজড়িত গুরুত্বপূর্ণ কিছু স্থান:

বুরাক দেয়াল

এ দেয়ালটি পবিত্র ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বর্ণিত আছে, রাসুল মিরাজের রাতে এর পাশেই নিজের বাহন বেঁধেছিলেন। এ কারণেই একে 'বুরাক দেয়াল' বলা হয়। মুসলিমরা এই দেয়ালের সঙ্গে 'মসজিদে বুরাক' নামে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইহুদীরা পবিত্র ভূমিকে দখল করে মুসলিমদের স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করে। মসজিদে বুরাকও এই তালিকায় শামিল হয়। এরপর তারা তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে নিজেদের ইবাদতের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে। তারা এই দেয়ালকে সুলাইমান আ.-এর নির্মাণের অবশিষ্টাংশ মনে করে এবং এখানে এসে কান্নাকাটির পাশাপাশি বিভিন্ন চিঠি লিখে রেখে যায়। একে তারা 'কান্নার দেয়াল' (Wailing Wall) নামে নামকরণ এবং নিজেদের অধিকার বলে দাবি করে।

সোনালি গম্বুজ বা কুব্বাতুস সাখরা

এটি মসজিদে আকসার মূল মসজিদ কাঠামো থেকে ৫০০ মিটার দূরে উঁচু একটি চত্বরের ওপর নির্মিত। এটি কুব্বাতুস সাখরা নামে পরিচিত। কুব্বাহ শব্দের অর্থ গম্বুজ আর সাখরা অর্থ পাথর। এই গম্বুজ পবিত্র ভূমির আঙিনায় অবস্থিত কুদরতি একটি পাথরের ওপর নির্মিত। তাই একে কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দ্য রক বলা হয়। এই স্থাপনাটি অষ্টভুজ আকৃতিতে নির্মিত, যার প্রতিটি বাহু ৬৬ ফুট দীর্ঘ, যার ভেতরের ব্যাস ১৯২ ফুট; আর গম্বুজের ভিত্তির

ব্যাস ৬৬ ফুট। গম্বুজটি ৯৯ ফুট উচ্চতায় কাঠনির্মিত, যার বাহিরের দিক থেকে পিতল দিয়ে আবৃত করে সোনালি প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ভেতরের দিকে চিনামাটির আস্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে সূক্ষ্ম জাঁকজমকপূর্ণ সোনালি কারুকাজ করা হয়েছে। উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান এর নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং তার ছেলে ওয়ালিদ ইবনু আবদুল মালিকের হাতে নির্মাণকাজ পূর্ণতা লাভ করে।

মিশর থেকে প্রাপ্ত উমাইয়া শাসকদের সাত বছরের পুরো রাজস্ব এই নির্মাণকাজে ব্যয় করা হয়। বর্তমান স্থাপনা উসমানি সুলতান আবদুল হামিদ ও সুলতান আবদুল আজিজ কর্তৃক সংস্কারকৃত। যার ফলে বহির্দেয়ালের কারুকার্য, ৩৮টি রঙিন গ্লাসের জানালা ও সাজসজ্জায় তুর্কি নির্মাণশৈলীর ছাপ বিদ্যমান। দেয়ালের বাইরে চতুর্দিকে পাথরের ওপর 'সূরা বনি ইসরাইল' ও 'ইয়াসিন' অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লিপিশৈলীতে খোদাই করা হয়েছে।

মুসলিম শাসকরা উন্নত নির্মাণশৈলীর মাধ্যমে আল-কুদসকে দর্শনীয় স্থানে পরিণত করেছিলেন। এর ফলে মুসল্লিদের সুবিধার্থে এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার স্মারক হিসেবে নির্মিত ছোট ছোট অনেক স্থাপনা, মাদরাসা, গম্বুজ, চত্বর, পানির চৌবাচ্চা ও রোদঘড়ির দেখা পাওয়া যায়, যেগুলোর নির্মাণশৈলী স্থাপত্যশিল্পের অনন্য নিদর্শন হিসেবে স্থানটিকে পরিচিত করেছে।

মসজিদের অন্তর্গত ঐতিহাসিক স্থানগুলো হলো:

মসজিদ-কম্পাউন্ড

মসজিদের কিবলার দিকের দেয়ালে একটি মিহরাব আছে, যাকে 'মিহরাবে দাউদ' বলা হয়। মিহরাবের সঙ্গে একটি মিম্বার ছিল, যেটি ইসলাম ও মুসলিমদের গৌরব সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী আলেপ্পো থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন।
কম্পাউন্ডের পশ্চিম দিকে একটি লোহার কুঠুরি আছে। সেখানে 'মিহরাবে মুআবিয়া' নামে একটি মিহরাব আছে। পূর্ব দিকে রয়েছে ‘জামে উমর’। এছাড়া উত্তর দিকে ‘মিহরাবে জাকারিয়া’ নামেও একটি মিহরাব রয়েছে।

মাদরাসাসমূহ

হারাম অংশের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে পাঁচিল আছে, তার সঙ্গে প্রশস্ত একটি বারান্দা, যার আন্ডারগ্রাউন্ড ও উপরের তলাগুলোতে শ্রেণিকক্ষ ও ছাত্রাবাস। এর মধ্যে কিছু স্থাপনা মুসলিম ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাদের ও তাদের পরিবারের ইসালে সাওয়াবের জন্য নির্মাণ করেছিলেন। এর সঙ্গে ছোট-বড় অনেক কক্ষ ছাত্রদের থাকার জন্য নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাদরাসা-মাদরাসায়ে গাজিয়া, মাদরাসায়ে কারিমিয়া, মাদরাসায়ে বাসিতিয়া, মাদরাসায়ে তুলুনিয়া, মাদরাসায়ে উসমানিয়া।

গম্বুজসমূহ

জ্ঞানচর্চা, আল্লাহর স্মরণ, ইবাদতের নির্জন জায়গা অথবা ঐতিহাসিক স্মারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল ছোট ছোট অনেক গম্বুজ, যা আজও মসজিদে আকসার আঙিনার শোভা বর্ধন করছে। বিভিন্ন শাসক এই গম্বুজগুলো নির্মাণ করেছিলেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি হচ্ছে 'মিরাজ গম্বুজ', যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মিরাজ গমনের স্মারক হিসেবে নির্মাণ করা হয়।

চত্বরসমূহ

নামাজ আদায়, জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানের আসরের জন্য অনেক চত্বর বানানো হয়েছিল। সাধারণভাবে সুন্দর পাথর দ্বারা এগুলো নির্মাণ করে কিবলার দিকে মিহরাবসদৃশ একটি কাঠামো নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিল। এসব চত্বরের বেশির ভাগ পবিত্র ভূমির পূর্ব দিকের আঙিনায় অবস্থিত। অধিকাংশ চত্বর উসমানি খিলাফতকালে নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের মোট ২৪টি চত্বর আছে, যার মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি হচ্ছে- কর্কের চত্বর, বাসিরি চত্বর, সুলতান জাহিরের চত্বর।

মিনারসমূহ

বায়তুল মাকদিস থেকে শহরের বসতি উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকায় সেদিকে আজান দিতে চারটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল। এ চারটি মিনার এ শহরের বিনির্মাণের দ্বিতীয় যুগে নির্মাণ করা হয়। এসব মিনার মসজিদের চারটি দরজা-সংলগ্ন করে নির্মাণ করা হয়েছিল। মিনারগুলোর

নাম হচ্ছে পশ্চিম ফটকের মিনার, সিলসিলা ফটকের মিনার, গাওয়ানেমা ফটকের মিনার, আসবান ফটকের মিনার।

পানির ফোয়ারাসমূহ

নামাজ ও দর্শকদের সুবিধার্থে এই স্থাপনার নির্মাতারা বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক পরিমাণে পানির ফোয়ারা, কুয়া ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করেছিলেন। পুরো মসজিদে আকসার সীমানায় মোট ২৫টি কুয়া আছে, যার মধ্যে ১৭টি মসজিদের আশপাশে। বাকি আটটি সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট স্থাপনার আশপাশে অবস্থিত। এ ছাড়া আরও নয়টি ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়েছিল। কাসুল ফাওয়ারা নামে সুদর্শন একটি হাউজ মসজিদের দরজার সামনে ছিল। এটি ৫৭৯ হিজরিতে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী নির্মাণ করেছিলেন।

সূর্যঘড়ি ও আন্ডারগ্রাউন্ড

মসজিদে আকসায় দুটি সূর্যঘড়ি ছিল, যেগুলোর মাধ্যমে সঠিকভাবে নামাজের সময় নির্ণয় করা যেত। একটি ছিল মসজিদের সামনে, আরেকটি সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট চত্বরের সামনে। এ ছাড়া মসজিদের মূল হলের নিচে ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষ ছিল, যেটি খ্রিষ্টানরা 'আস্তাবলে সুলাইমানি' নাম দিয়ে ঘোড়া বাঁধার কাজে ব্যবহার করত। স্তম্ভের ওপর নির্মিত এই ভূগর্ভস্থ কক্ষকে পুরাতন মসজিদে আকসাও বলা হয়।

মুসলমানদের কাছে মাসজিদুল আকসা ও ফিলিস্তিন অসামান্য মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য ও প্রাণাধিক প্রিয় হওয়ার পেছনে যেসব ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নরূপ:

- আল আকসার মর্যাদা ও গুরুত্ব
- নবীগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান
- ফিলিস্তিন সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যৎ বাণী

আল আকসার মর্যাদা ও গুরুত্ব

মাসজিদুল আকসার একটি বিশেষ ফযীলত হল, আল্লাহ একে বরকতময় করেছেন। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে আশপাশের জনপদকেও বরকতপূর্ণ করে দিয়েছেন।

জেরুজালেম মুসলমানদের কাছে 'আল-কুদস' নামে পরিচিত। কুদস শব্দের অর্থ পবিত্র। এখানেই আছে বাইতুল মুকাদ্দাস বা বাইতুল মাকদিস, পবিত্র কুরআনে যাকে বলা হয়েছে আল-আকসা। আকসা শব্দের অর্থ দূরবর্তী। সম্ভবত মক্কা থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা একে মাসজিদুল আকসা নামে অভিহিত করেছেন। মাসজিদুল আকসা এবং আশপাশের এলাকাকে পবিত্র কুরআনে পবিত্র ভূমি আখ্যা দেয়া হয়েছে। এটাও মসজিদুল আকসার অনন্য বৈশিষ্ট্যের একটি। মুসলিমদের নিকট আল-কুদসের রয়েছে অসামান্য মর্যাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে জানা যায়, 'আল-কুদসের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কোনো নবী নামাজ পড়েননি বা ফেরেশতা দাঁড়াননি।' (তিরমিজি)

১. ইসলামের প্রথম কিবলা

মসজিদে আকসার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলিম উম্মাহর প্রথম কিবলা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ بِمَكَّةَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَالْكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَبَعْدَ مَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালে কাবাঘরকে সামনে রেখে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করতেন। মদিনায় হিজরতের পর ১৬ মাস পর্যন্ত মাসজিদুল আকসার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন। অতঃপর কিবলা পবিত্র কাবাঘরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৯৯১; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১১০৬৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৯৬৭

তাই বায়তুল মুকাদ্দাসকে ইসলামের প্রথম কিবলা বলা হয়। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের কিবলা পবিত্র কাবাঘরের দিকে ফিরিয়ে দেন। পবিত্র কুরআনে সেই ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَدْ نَرٰي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَه

"আকাশের দিকে বারবার তোমার মুখ ফেরানোকে আমি অবশ্যই খেয়াল করি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফেরাও।"(সুরা বাকারা : ১৪৪)

২. দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ

মাসজিদুল আকসার একটি বড় পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হল, এটি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রাচীন মসজিদ। মাসজিদুল হারামের পরেই এই মসজিদের বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْمَسْجِدُ الأَقْصى. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً...

'আবু যর রা. বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ স্থাপিত হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোন মসজিদ? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। বললাম, এই দুইয়ের নির্মাণের মাঝে কত সময়ের ব্যবধান? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর।' —সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৩৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫২০

৩. তৃতীয় মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ

ইসলামের দৃষ্টিতে সবচে মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মাসজিদুল হারাম, যা পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত। দ্বিতীয় মর্যাদাপূর্ণ মসজিদ হল মাসজিদুন নববী, যা মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত। এই দুই মসজিদের পরেই তৃতীয় পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠতম মসজিদ হল মাসজিদুল আকসা, যা ফিলিস্তিনের জেরুজালেম শহরে অবস্থিত। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

‘সফর করলে তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত। মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন নববী, এবং মাসজিদুল আকসা।’—সহীহ বুখারী, হাদীস **১১৮৯**; সহীহ মুসলিম, হাদীস **১৩৯৭**

এই হাদীস প্রমাণ করে মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন নববীর পরেই মর্যাদার দিক থেকে মাসজিদুল আকসার অবস্থান।

৪. আল আকসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইসরা-মিরাজ

মিরাজের রাতে মহান আল্লাহ বিশেষ বাহন বুরাকে করে নবীজিকে প্রথমে মক্কা থেকে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে যান। পবিত্র কুরআনে সেই বিরল সুযোগপ্রাপ্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

سُبْحٰنَ الَّذِيٓ اَسْرٰي بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

‘পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার পরিবেশকে আমি করেছি বরকতময়, যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।’(সূরা আল ইসরা,আয়াত:১)

মসজিদুল আকসায় মহানবী সা. সব নবী-রাসুলের সামনে নামাজের ইমামতি করার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি বলেছেন এরপর আমি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলাম। পরিশেষে সেখান থেকে আমাকে ঊর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয়।

মসজিদে আকসার গুরুত্ব বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, মিরাজ রজনীতে আমাদের নবীজী ঊর্ধ্বজগতের সফর শুরু করার পূর্বে জিবরীল আমীনের সাথে প্রথমে এই মসজিদে এসেছেন এবং নামায আদায় করেছেন। তিনি ইমামতি করেছেন আর সমস্ত নবীগণ তাঁর ইকতিদা করেছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাইতুল মাকদিসের বিবরণ দিতে গিয়ে) বলেন—

وقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّه مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِه شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ

الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلاَمُ- قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي نَفْسَه- فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَمْتُهُمْ

"আর আমি নিজেকে আম্বিয়া আলাইহিস সালামের জামাতের মধ্যে দেখতে পেলাম। দেখি, হযরত মূসা আ. নামাযরত আছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও দীর্ঘ দেহের অধিকারী। তার চুল কোঁকড়ানো, যা ছিল কান পর্যন্ত ঝুলন্ত। দেখে মনে হবে, যেন 'শানওয়া' গোত্রেরই একজন লোক। হযরত ঈসা আ.-কেও নামাজে দণ্ডায়মান দেখা গেল। তাঁর আকার আকৃতি সাহাবী উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী রা.-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। হযরত ইবরাহীম আ.-কেও নামাজরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার দেহাবয়বের সাথে আমার দেহাবয়বের মিল বেশি। ইতিমধ্যে নামাজের সময় হয়ে গেল আর আমি তাদের সকলের ইমামতি করলাম।" —সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭২

একটি দীর্ঘ হাদীসের বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حتى أَمَمْتُهُم.

"অতঃপর আমি বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করলাম। সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করা হল। জিবরীল আমাকে সামনে এগিয়ে দিলেন আর আমি তাঁদের ইমামতি করলাম।" —সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৪৪৯

নবী-রাসূলগণের স্মৃতিবিজড়িত স্থান

পৃথিবীর পবিত্রতম ভূখণ্ড ফিলিস্তিন। আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র ভূমিতে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন এবং একাধিক নবী-রাসুল এই ভূমিতে আশ্রয়ও নিয়েছেন। ফিলিস্তিনে রয়েছে নবীদের সমাধি।

হজরত ইবরাহীম আ. ফিলিস্তিনে হিজরত করে এসেছিলে। ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত হেবরন শহরে তিনি সমাহিত আছেন।

লূত আলাইহিস সালাম তার কওমকে পরিত্যাগ করার পর আল্লাহর আযাবের পর ফিলিস্তিনেই হিজরত করেছিলেন।

হজরত ইবরাহীম আ.-এর বড় ছেলে ইসহাক আ. কেনানেই বসবাস করতেন। ইবরাহীম আ. এর পাশেই তাকে সমাহিত করা হয়।

হজরত ইয়াকুব আ. তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে হেবরনে পরিবারের কয়েকজন সদস্যসহ সমাহিত হয়েছেন।

হজরত ইউসুফ আ. মৃত্যুর আগে অসিয়ত করে যান, যখন তারা মিশর ত্যাগ করবে, তখন তাদের সঙ্গে তাকেও যেন নিয়ে যাওয়া হয়। মৃত্যুর পর তার মরদেহ মিশরে একটি কফিনে সংরক্ষণ করা হয় এবং তার অসিয়ত অনুযায়ী ফিলিস্তিনের পুণ্যভূমিতে তাকে সমাহিত করা হয়। বর্তমান ফিলিস্তিনের হেবরনে তার সমাধি রয়েছে। ইসলামি বিশ্বকোষের বর্ণনামতে, তার সমাধি ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরে অবস্থিত।

হজরত মূসা আ. ফিলিস্তিনে প্রবেশ করার পূর্বেই সিনাই পর্বতের কাছে ইন্তেকাল করেন। মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সিনাই পর্বতও প্রাচীন ফিলিস্তিনেরই অন্তর্ভুক্ত।

হজরত দাউদ আ. ফিলিস্তিনেই বসবাস করতেন। এখানেই তিনি তার মিহরাব নির্মাণ করেছিলেন। জেরুজালেমের ওল্ড সিটির বাইরে হজরত দাউদ আ.-এর সমাধি রয়েছে বলে জানা যায়। খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের মতো মুসলমানরাও বেথলহামে দাউদ আ.-এর সমাধি আছে বলে ধারণা করতেন। ক্রুসেড যুদ্ধের সময় জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পাহাড়ে যে সমাধি পাওয়া গেছে, তা হজরত দাউদ আ.-এর সমাধি বলে অভিহিত করা হয়।

হজরত সুলাইমান আ. ফিলিস্তিনেই বসবাস করতেন এবং এখান থেকেই তিনি অর্ধ দুনিয়া শাসন করেছেন। তার সমাধি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। যতটুকু ধারণা করা হয়, তার সমাধিও হারাম শরিফ তথা আকসা মসজিদের আশপাশেই রয়েছে। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে এই পুণ্যভূমির কোনো এক স্থানেই শায়িত আছেন তিনি।

যাকারিয়া আ. ফিলিস্তিনেই তার মিহরাব নির্মাণ করেছিলেন।

নাবলুসের পার্শ্ববর্তী শহর সেবাসতিয়ার ফিলিস্তিনি একটি গ্রামে হজরত ইয়াহইয়া আ.-এর মসজিদ ও সমাধি অবস্থিত।

মূসা আলাইহিস সালাম এর বাইতুল মাকদিসে মৃত্যুর তামান্না

পবিত্র ভূখণ্ডে জীবন অতিবাহিত করার পাশাপাশি মৃত্যুবরণ করাও একজন মুমিনের পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বাইতুল মাকদিস যেহেতু পবিত্রতম স্থান, তাই তো হযরত মূসা আ. এই মাটিতে মৃত্যুর আরজি পেশ করেছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা আ.-এর মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন—

فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ المُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الكَثِيبِ الأَحْمَرِ.

তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তাকে পবিত্র ভূখণ্ডের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখান থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে পবিত্র ভূখণ্ডে পতিত হবে। যদি আমি সেখানে থাকতাম, তবে লাল টিলার কাছে রাস্তার পাশে আমি তোমাদেরকে তার কবর দেখিয়ে দিতাম। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩৭২

এই হাদীসে পবিত্র ভূখণ্ড দ্বারা বাইতুল মাকদিস উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

যিয়ারতকারীর জন্য সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর বিশেষ দুআ

মসজিদে আকসার একটি বড় ফযীলত হল, হযরত সুলাইমান আ. এই মসজিদ যিয়ারতকারীর জন্য একটি বিশেষ দুআ করেছিলেন। আর স্বয়ং আমাদের নবী এই দুআ কবুল হওয়ার বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللهَ ثَلاَثًا: حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَه، وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه، وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ، إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِه كَيَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّه.

সুলাইমান ইবনে দাউদ আ. যখন বাইতুল মাকদিস নির্মাণ থেকে ফারেগ হলেন, আল্লাহর কাছে তিনটি দুআ করলেন—

১. তার প্রতিটি ফায়সালা যেন আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক হয়।

২. তাকে যেন এত বড় রাজত্ব দেওয়া হয়, যা তাঁর পরে আর কাউকে দেওয়া হবে না।

৩. একমাত্র নামাজের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এই মসজিদে আগমন করবে, আল্লাহ যেন তাকে সেদিনের মতো নিষ্পাপ করে দেন, যেদিন তার মা তাকে জন্মদান করেছেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রথম ও দ্বিতীয় দুআ তো আল্লাহ কবুল করেছেন। আর আমি আশাবাদী আল্লাহ তাঁর তৃতীয় দুআও কবুল করেছেন। —সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৬৯২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৪০৮

কুরআন হাদীসের বর্ণনা

১. বরকতময় ভূমি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেন—

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَي الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًي ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ۭ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ

আর তাদের ও যে সব জনপদের মধ্যে আমি বরকত দিয়েছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে আমি অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। (তাদেরকে বলা হয়েছিল) ‘তোমরা এসব জনপদে রাত-দিন (যখন ইচ্ছা) নিরাপদে ভ্রমণ কর’। (সূরা সাবা, আয়াত:১৮)

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এখানে বরকতময় জনপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল বাইতুল মাকদিসের জনপদ। —তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ. ৬, পৃ. ৪৬৮

২. সওয়াবের নিয়তে সফর

আহলে ইলমগণ এ ব্যাপারে একমত যে মাসজিদুল আকসায় যিয়ারতের জন্য গিয়ে সেখানে নামাজ পড়াটা মুস্তাহাব। শুধুমাত্র তিনটি মসজিদের জন্য বাহনের গতি বাড়িয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ সেখানে যিয়ারতের জন্য যাওয়া যায়। এই তিনটি মসজিদের মর্যাদা অন্য যে কোনো মসজিদের চাইতে বেশি। সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী এবং মুসলিমে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আছে, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া আর অন্য কোনো মসজিদের দিকে বাহনের গতি বাড়ানো যাবে না-মাসজিদুল হারাম মাসজিদুল আকসা এবং আমার এই মসজিদ।'

৩. মাসজিদুল আকসায় নামাজের সওয়াব

মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুন নববীর পাশাপাশি মাসজিদুল আকসায় নামাজ পড়ার সওয়াবও অন্যান্য মসজিদের তুলনায় অনেক গুণ বেশি।
হযরত আবুদ দারদা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.

মাসজিদুল হারামের নামাজ এক লক্ষ নামাজের সমতুল্য। আমার মসজিদে (মাসজিদুন নববীতে) নামাজ এক হাজার নামাজের সমতুল্য। আর বাইতুল মাকদিসের নামাজ পাঁচশত নামাজের সমতুল্য। —মুসনাদে বাযযার (কাশফুল আসতার), হাদীস ৪২২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৩৮৪৫

৪. মাসজিদুল আকসার খিদমতে অংশগ্রহণ

যদি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করা বা মাসজিদুল আকসায় নামাজ আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কোনোভাবে এই মসজিদের খিদমতে অংশগ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাইমুনা রা. বলেন—

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَأْتِيَهُ فَلْيُهْدِ إِلَيْهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، فَإِنَّ مَنْ أَهْدَى إِلَيْهِ زَيْتًا كَانَ كَمَنْ قَدْ أَتَاهُ.

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করতে সক্ষম না হবে, সে কী করবে?
তিনি বললেন, যে ব্যক্তি এখানে আসার সামর্থ্য রাখবে না, সে যেন এখানের বাতি জ্বালানোর জন্য তেল হাদিয়া পাঠায়। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তেল হাদিয়া পাঠাবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হবে, যে সরাসরি বাইতুল মাকদিস যিয়ারত করেছে। —মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৭৬২৬

১৭ হিজরীতে যখন বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতে এলো তখন উমার রা. এই মসজিদে নামাজ পড়েছেন এবং নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়েছেন। (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬১)
ইবনে কাসীর রাহ. এই হাদীসের সনদকে ‘হাসান’ বলেছেন। —মুসনাদে ওমর ১/১৬০

৫. মাসজিদুল আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করা

এক পবিত্র ভূখণ্ড থেকে আরেক পবিত্র ভূখণ্ডে সফর করা কতইনা আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। একারণেই হাদীস শরীফে মাসজিদুল আকসা থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হযরত উম্মে সালামাহ রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَه

যে ব্যক্তি বাইতুল মাকদিস থেকে ইহরাম বেঁধে উমরাহ্ করবে, তার গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে। —সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩০০১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎ বাণী

১. বাইতুল মাকদিসের সান্নিধ্যে বসবাস

পবিত্র ভূখণ্ডের সান্নিধ্যে কিছু সময় যাপন করতে পারাই তো সৌভাগ্যের বিষয়। উপরন্তু বসবাসের জন্য যদি এক টুকরো মাটি পাওয়া যায়, তাহলে এটা তো আরো অনেক বড় প্রাপ্তি। একারণেই হাদীস শরীফে বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি বসবাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আবু যার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ شَطَنِ فَرَسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا

অচিরেই এমন সময় আসবে, যখন কোনো ব্যক্তি যদি ঘোড়ার রশি পরিমাণ জায়গাও পেয়ে যায়, যেখান থেকে বাইতুল মাকদিস দেখা যায়, তাহলে এটা তার জন্য সমগ্র দুনিয়া থেকে বেশি উত্তম হবে। —মুসতাদরাকে হাকেম ৪/৫০, হাদীস ৮৫৫৩; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৬৯৭৯, ৮২২৬

২. আহলে হকের অবস্থানস্থল

বাইতুল মাকদিস এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বদা এমন একটা জামাতের উপস্থিতি থাকবে, যারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু উমামা বাহিলী রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لَعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَّا مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لَأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِس.

আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা সত্যের ওপর অবিচল থাকবে। তাদের দুশমনদের ওপর বিজয়ী থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ আসবে আর তারা এভাবেই থেকে যাবে।
সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেসা করলেন, এই দলটির অবস্থান কোথায় হবে?
তিনি বললেন, বাইতুল মাকদিস ও তার আশেপাশে। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩২০; আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ৭৬৪৩

নুরুদ্দীন হাইসামী রাহ. বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য। —মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৭/৫৬৪

৩. হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই

পৃথিবীতে মানব জাতির যাত্রালগ্ন থেকেই শুরু হয়েছে হক ও বাতিলের লড়াই, সত্য ও মিথ্যার সংঘাত। এটা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে হক-বাতিলের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী লড়াই হবে বাইতুল মাকদিস অঞ্চলে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ.

কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ না মুসলিমগণ ইহুদীদের সাথে লড়াই করবে আর মুসলিমগণ তাদের হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা যে পাথর বা গাছের পেছনেই আত্মগোপন করবে, সে পাথর বা গাছও বলে উঠবে, হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে আমার পেছনে ইহুদী আছে। এসো তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ গাছ কিছু বলবে না; কারণ এটা ইহুদীদের গাছ। —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯২২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২৯২৬

ইমাম নববী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'গারকাদ' একধরনের কাঁটাদ্বার গাছ, যা বাইতুল মাকদিসে প্রচুর পরিমাণে হয়। আর সেখানেই দাজ্জাল ও ইহুদী বধের ঘটনা ঘটবে। (দ্র. শরহে মুসলিম, নববী ১৮/৪৫)

৪. ঈসা আলাইহিস সালাম এবং দাজ্জাল নিধন

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জালের গতিবিধির কথা আমাদের বলতে লাগলেন-'তার আকাশে উড়ার এবং মাটিতে চলার এমন বর্ণনা দিলেন যেন সে এক মৌমাছি। এমন সময় আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। দামেস্কের পূর্বে একটি সাদা মিনারের উপর তিনি অবতরণ করবেন। তখন তাঁর হাত দু'টি থাকবে দুই ফেরেশতার ডানার উপর। তখন তিনি মাথা নাড়তেই পানির ফোঁটা বের হতে থাকবে। আর মাথা উঠালেই মুক্তার মতো কিছু পদার্থ বের হবে। তার শ্বাস যার গায়ে লাগবে সে যদি কাফের হয় তবে সে মারা যাবে। তার দৃষ্টি যতদূর যাবে তার শ্বাস প্রশ্বাসও ততদূর যাবে। তখন লুদ্দাতে ফটকের সামনে দাজ্জাল আত্মরক্ষা করতে চাইলে সেখানেই তাকে হত্যা করা হবে।'

এখানে যে লুদ্দার কথা বলা হয়েছে এটা বর্তমান ফিলিস্তিনের একটি প্রসিদ্ধ এলাকা। ইমাম নববী র. বলেন, 'এটা হচ্ছে বাইতুল মাকদিসের কাছাকাছি একটি এলাকা। এই দাজ্জাল শাম এলাকার হবে আর তার বসবাস হবে বাইতুল মাকদিসের আশেপাশে। সে হবে ইহুদী বংশের লোক। হিত্তীনের যুদ্ধে যেমন ক্রুসেডাররা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে, আইনজালুতের যুদ্ধে যেমন তাতাররা পরাজিত হয়েছে তেমনি লুদ্দাতে পরাজিত হবে ইহুদী দাজ্জাল।'

৫. মালহামাতুল কুবরা

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই ঘটনা না ঘটার আগে কেয়ামত হবে না। রোমকরা আ'মাক কিংবা যাবেক এলাকায় ঢুকে পড়বে। তখন মদীনা থেকে একটি বাহিনী বের হবে আর তারাই হবে পৃথিবীর সেরা। যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি দাঁড়াবে তখন রোমকরা বলবে, আমাদেরকে তাদের সাথেই যুদ্ধ করতে দাও তোমাদের মধ্যে যারা আমাদেরকে গালমন্দ করেছে। তখন মুসলমানরা বলবে আল্লাহর কসম আমরা আমাদের ভাইদেরকে কখনো তোমাদের কাছে ঠেলে দিব না। তারপর যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাদের তিন ভাগের এক ভাগ মারা যাবে যাদের আল্লাহ কখনো মাফ করবে না। আর তিন ভাগের এক ভাগ শহীদ হয়ে যাবে। তারাই হবে আল্লাহর সবচাইতে প্রিয়শহীদ। আর তিন ভাগের এক ভাগ বিজয় লাভ করবে। তারা আর কখনো বিপদের মুখোমুখি হবে না। এরপরই কনস্টান্টিনোপেল বিজয় হবে।' ইমাম নববি বলেন আ'মাক আর দাবেক শাম এলাকার হালাবের (আলেপ্পো) কাছাকাছি একটি জায়গা।

৬. হাশরের ময়দান

বিশ্বজগৎ ধ্বংসের পর আবার প্রাণীরা জাগবে। তারা সবাই বিচারের মুখোমুখি হবে। বিচারের সেই প্রধান কেন্দ্রটি হবে ফিলিস্তিনের ভূমি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন বায়তুল মাকদিস হবে হাশরের ময়দান। তোমরা তাতে গিয়ে নামাজ আদায় করো। কেননা এতে এক ওয়াক্ত নামাজ অন্যান্য মসজিদে নামাজ আদায়ের তুলনায় অধিক সওয়ার পাবে। তিনি আরও বলেন যে ব্যক্তি সেখানে যেতে অক্ষম হবে সে যেন এর জ্বালানির জন্য তেল হাদিয়া হিসেবে পাঠায়। কেননা যে বায়তুল মাকদিসের জন্য হাদিয়া পাঠাবে সে এতে নামাজ আদায়কারীর মতো সওয়ার লাভ করবে।

বাইতুল মাকদিসের গুরুত্ব এখান থেকেও বোঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন এটাই হবে হাশরের ময়দান। হযরত মাইমুনা রা. বলেন—

يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: هُوَ أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَأَرْضُ الْمَنْشَرِ ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ...

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বাইতুল মাকদিস সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন এটা হবে হাশরের ময়দান। এখান থেকে মানুষ নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে যাবে। তোমরা এখানে আসো এবং নামায আদায় করো...।” —মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৭০৮৮

নুরুদ্দীন হাইছামী রাহ. বলেন এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, আল আকসা বা বাইতুল মাকদিস ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ আর মুসলিম উম্মাহর জন্য কতই না গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গোটা মুসলিম উম্মাহ আল আকসার বিষয়ে দায়িত্বহীনতার শিকার হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক ইতিহাস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুওত লাভের দ্বাদশ বছর প্রথম বাইআতে আকাবা ও দ্বিতীয় বাইআতে আকাবার মাঝামাঝি সময়ে ইসরা ও মিরাজ সংঘটিত হয়। এর মাধ্যমেই বাইতুল মাকদিসে ইসলামী যুগের শুরু হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের মাঝে যুদ্ধ বাধে। সেই যুদ্ধে পারসিকরা বিজয়ী হয় এবং রোমানরা পরাজিত হয়। অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে রোমানরা পারসিকদের পরাজিত করে। আহযাব যুদ্ধের সময় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিন জয়ের সুসংবাদ দেন।

অষ্টম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিলিস্তিন, দামেশক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানীর কাছে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠালে শুরাহবিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতকে হত্যা করে যার পরিণামে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় মনোযোগী ছিলেন। তাঁর ওফাতের এক মাস আগে তিনি উসামা ইবনে যায়েদ রা.-এর নেতৃত্বে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। তবে নবীজীর ওফাতের কারণে এ বাহিনী অভিযানে বের হওয়া থেকে বিরত থাকে।

খেলাফতের বাইআত সম্পন্ন হওয়ার পর আবু বকর রা. সর্বপ্রথম এ বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ করেন। শাম অভিযানের জন্য তিনি মুজাহিদ বাহিনী গঠনে মনোযোগী হন। এই অভিযান পূর্ণতা লাভের আগেই তিনি দুনিয়া ত্যাগ করেন।

মুসলিম শাসনামলের সূচনা

উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর জেরুজালেম বিজয়

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমার ইবনুল খাত্তাব রা.-এর শাসনামলে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম বিজয় ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়।

৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয় লাভের পর মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ রা. ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. জেরুজালেম অবরোধ করেন। কয়েক মাস ধরে চলা এই অবরোধের পর জেরুজালেমের খ্রিষ্টান শাসকরা ঘোষণা দেন যে তারা আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত, তবে সরাসরি মুসলিম খলিফার কাছে চাবি হস্তান্তর করতে চান।
এই খবর শুনে উমার রা. মদিনা থেকে জেরুজালেমে যাত্রা করেন। তার যাত্রা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও বিনয়পূর্ণ। তিনি একটি সাধারণ উটে চড়ে মদিনা থেকে রওনা দেন, পথে কখনো নিজে উটের পিঠে বসতেন কখনো খাদেমকে বসাতেন আর তিনি দড়ি ধরে হাঁটতেন। জেরুজালেম পৌঁছার পর তার পোশাক, আচরণ এবং সাধারণ জীবনযাত্রা দেখে সেখানের অধিবাসীরা বিস্মিত হন।
এরপর উমার রা. শহরের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি করেন। তিনি খ্রিষ্টানদের সঙ্গে নিম্ন লিখিত দু'টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন:

এক. খ্রিস্টানদের বিভিন্ন গির্জাঘর ও উপাসনালয় নিরাপত্তা পাবে।

দুই. এই পবিত্র শহরে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না।

ঐতিহাসিক সেই চুক্তিনামাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

সাইয়্যিদিনা উমার রা.- এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিনামা

পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ'র নামে ঘোষণা করা হচ্ছে, আল্লাহর বান্দা, আমিরুল মু'মিনীন উমার জেরুজালেমের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছেন। নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তাদের জান, মাল, গির্জা, ক্রুশ, শহরের সুস্থ-অসুস্থ ও তাদের ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানের। মুসলিমরা তাদের গির্জা দখল বা ধ্বংস করবে না। তাদের জীবন এবং যে ভূমিতে তারা বসবাস করছে, তাদের ক্রুশ অথবা সম্পদ- ধ্বংস করা হবে না কোনোকিছুই। ধর্মান্তরিত করা হবে না জোরজবরদস্তি। কোনো ইহুদি তাদের সঙ্গে বসবাস করবে না জেরুজালেম।

জেরুজালেমবাসী অন্যান্য শহরের মানুষের মতোই জিজিয়া (ট্যাক্স) প্রদান করবে এবং অবশ্যই বাইজেন্টাইন ও লুটেরাদের বিতাড়িত করতে হবে। জেরুসালেমের যেসব বাসিন্দা বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক, গির্জা ও ক্রুশ ছেড়ে নিজের সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে চায়, আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা পাবে। গ্রামের অধিবাসীরা চাইলে শহরে থেকে যেতে পারে এই শর্তে, শহরের অন্যান্য নাগরিকের মতো তাদেরকেও জিজিয়া প্রদান করতে হবে। যার ইচ্ছে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে পারে। যার ইচ্ছে থেকে যেতে পারে নিজের পরিজনদের কাছে। ফসল কাটার আগে তাদের থেকে নেওয়া হবে না কিছুই।
চুক্তি অনুযায়ী যদি তারা জিজিয়া প্রদান করে, তাহলে এই চুক্তির অধীনস্ত শর্তসমূহ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকারবদ্ধ, তাঁর নবীর ওপর অর্পিত দায়িত্বের ন্যায় সমস্ত খলিফা এবং ঈমানদারদের পবিত্র কর্তব্য বলে ধর্তব্য।(১০ তারিখে তাবারি : The Great Arab Conquests)

এই চুক্তি অনুযায়ী, শহরের অধিবাসীদের জীবন, সম্পদ এবং উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। কারও ওপর ধর্মান্তরের জন্য কোনো চাপ সৃষ্টি করা হবে না, বরং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় থাকবে।

ঐতিহাসিক সেই চুক্তিপত্র ‘আহদিয়ায়ে উমরিয়্যাহ’ নামে বিখ্যাত। চুক্তিনামাটি আলকুদসের কিয়ামাহ গির্জায় আজও সংরক্ষিত আছে।

জেরুজালেম বিজয়ের পর উমর রা. সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে সম্মানিত স্থাপনাগুলোকে পরিষ্কার করেন এবং বিজয়ী সাহাবীদের কাফেলাকে সাথে নিয়ে নবীজীর বুরাক বাঁধার স্থানের পাশে নামাজ আদায় করেন। পরে তার নির্দেশে সেখানে কাঠ ও গাছের পাতা দিয়ে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, এটাই ছিল মাসজিদুল আকসা।

হজরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) ছিলেন শামের প্রথম মুসলিম গভর্নর। তখন ফিলিস্তিন শামেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিজরী ১৮ সনে এক মহামারীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর গভর্ণর নিযুক্ত হন মুআয ইবনে জাবাল রা.। তার মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া রা. গভর্ণর নিযুক্ত হন । ১৯ হিজরীতে মুয়ায়াবিয়া রা. এর হাতে কায়সারিয়া জয়ের মধ্য দিয়ে গোটা ফিলিস্তিন মুসলিমদের হাতে চলে আসে এবং দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। উসমান রা. এর পুরো শাসনামল জুড়েই হযরত মুয়াবিয়া রা. গভর্ণরের পদে ছিলেন। এ শাসনামলের শেষের দিকে ফিতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তবে শাম ও ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা এ ফিতনা থেকে বিরত ছিলেন বলেই জানা যায়।

উমাইয়া শাসন ব্যবস্থা

মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফইয়ান-এর হাতে গোড়াপত্তন হয় উমাইয়া সাম্রাজ্যের। ৬৬০ থেকে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ(৪১-১৩২ হিজরী) পর্যন্ত এই সাম্রাজ্য দীর্ঘ ৯২ বছর স্থায়ী হয়। এ বছরগুলো ছিল শামের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য মর্যাদা, উন্নতি ও অগ্রগতির সময়। বিশেষ করে ফিলিস্তিনের জন্য। কেননা, উমাইয়া শাসকদের রাজধানী ছিল দামেশক। যা আল-কুদসের খুব কাছে অবস্থিত।

উমাইয়া সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড নিয়ে এক বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ যুগের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ৬৫ হিজরী সনে আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করেন। এ নির্মাণ কাজে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কুব্বাতুস সাখরার নির্মাণও তিনিই শুরু করেন। তাঁর পরবর্তী শাসক খলিফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এ নির্মাণ ছিল খুবই জাঁকজমকপূর্ণ।

৯৬ হিজরী থেকে ৯৯ হিজরী পর্যন্ত ছিল সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামল। তিনি গুরুত্বপূর্ণ একজন উমাইয়া খলিফা। ৯৭ হিজরী মুতাবেক ৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রামাল্লা শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এটা ছিল ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে উমাইয়া সাম্রাজ্যের অন্যতম কীর্তি।

১৩২ হিজরী মুতাবেক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং আব্বাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আব্বাসীয় শাসন ব্যবস্থা

আব্বাসী খিলাফত দীর্ঘকাল মুসলমানদের শাসনভার বহন করে। ১৩২ থেকে ৬৫৬ হিজরী দীর্ঘ ৫২৪ বছর এ খিলাফত স্থায়ী হয়। উমাইয়া খিলাফতের তুলনার আব্বাসী খিলাফতের আয়ু ছিল অনেক গুণ বেশি।

১৩২-২৪৭ হিজরী পর্যন্ত ১১৫ বছর ছিল আব্বাসী খেলাফতের সোনালী যুগ। ২৪৭-৬৫৫ হিজরী পর্যন্ত ৪০৯ বছর দুর্বলতার যুগ। আব্বাসী যুগে আল আকসার ঐতিহ্যের কার্যক্রম বেগবান হয়।

উমাইয়াদের মতো আব্বাসীরাও ফিলিস্তিনকে খুব গুরুত্ব দিত। তবে সেটা উমাইয়াদের পর্যায়ে ছিল না। কারণ, উমাইয়াদের রাজধানী ছিল দামেশকে, যা ফিলিস্তিনের কাছে। আব্বাসীরা দারুল খিলাফত বাগদাদে স্থানান্তর করে। দূরত্বের কারণে যত্নে কিছুটা ঘাটতি পড়েছিল।

আব্বাসী খেলাফতের শক্তিমত্তার যুগ ছিল ১১৫ বছর। ২৪৭ হিজরীতে আব্বাসী খলিফা মুতাওয়াক্কিল নিহত হন। তিনি ছিলেন শক্তিমত্তার যুগের সর্বশেষ খলিফা। এরপর শুরু হয় দুর্বলতার যুগ। এ যুগে বিভিন্ন প্রকার শক্তি আব্বাসী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আব্বাসী সাম্রাজ্য নামমাত্র টিকে থাকে। পর্দার আড়াল থেকে এবং কখনও কখনও সামনে থেকেই বিভিন্ন শক্তি সাম্রাজ্যের কলকাঠি নাড়ত। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল তুর্কী সামরিক ব্যক্তিরা। বুয়াই শিয়ারাও দীর্ঘকাল আব্বাসী সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। আবার কখনও আধিপত্য বিস্তার করেছে সালজুকরা।

আব্বাসী খেলাফতের দুর্বলতার কালে আব্বাসীয় গভর্নর আহমদ ইবনে তুলুন ২৫৪ হিজরী অর্থাৎ ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসী শাসন থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি স্বাধীন তুলুনী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। ২৬৪ হিজরী অর্থাৎ ৮৭৭ ঈসাব্দে তিনি ফিলিস্তিন অধিকার করেন। ফিলিস্তিন ৫৭ বছর তুলুনী রাজ্যের অধীনে ছিল। ফিলিস্তিনের ইতিহাসে এ শাসনামলের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। ৩২১ হিজরীতে মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদীর হাতে তুলুন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

তুলুনী রাজ্যের পতনের পর ৩২২ হিজরীতে মুহাম্মাদ ইবনে তুগজ ইখশীদীর হাতে মিসরে আরেক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সেটা ছিল ইখশীদী সাম্রাজ্য। ৩৮ বছর ইখশীদীরা ফিলিস্তিন শাসন করেন। ইখশীদী সাম্রাজ্যের এ যুগটিও ছিল আল-কুদস ও ফিলিস্তিনের জন্য উত্তম সময়। কারণ এই সাম্রাজ্য ছিল তুলনী সাম্রাজ্যের সহায়ক। উভয়' আমলে শাসনের প্রকৃতি অভিন্ন ছিল। ইখশীদী সাম্রাজ্যের সুলতানরা ফিলিস্তিনের প্রতি, বিশেষত আল-কুদসের প্রতি এতটাই গুরুত্ব: দিতেন যে, কোনো খলিফার ইন্তেকাল হলে তার মৃতদেহ দাফন করার জন্য আল-কুদসে নিয়ে যাওয়া হত। এ মহান ভূখণ্ডের সম্মানেই ছিল এ আয়োজন। এতকিছুর পরও এ আমলে এসে ফিলিস্তিনে সামরিক ও দাওয়াতী কার্যক্রম গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ৩৫৯ হিজরীতে ইখশীদী সাম্রাজ্যের পতনের পর ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে এ দুর্বলতা পুরোপুরি ফুটে ওঠে।

ফিলিস্তিনে শিয়া শাসন

আব্বাসীয়দের দুর্বলতার পুরো সুযোগ নেয় উবায়দিয়রা। ৩৫৯ হিজরীতে উবায়দিয়রা মিশর দখল করে নিতে সক্ষম হয়। সেই একই বছর তারা ফিলিস্তিন দখল করে। তারা ছিল নিকৃষ্টতম শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী। কমবেশি প্রায় ১০০ বছর পুরো ইসলামী বিশ্ব ছিল শিয়াদের নিয়ন্ত্রণে। উবায়দিয়দের দখলের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন তার ইতিহাসে অন্ধকার একটি যুগে প্রবেশ করে। যা তিনশতাধিক বছর দীর্ঘ হয়। প্রথমে ধারাবাহিক ১০৪ বছর ফিলিস্তিনে উবায়দিয়া শাসন চলে। সেই সময় দেশটিকে ইলম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দাওয়াত ও ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে পরিপূর্ণ শূন্য রাখা হয়। সুন্নী সব আলেমকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। যার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে ফিলিস্তিন ও মিশরে।

মুস্তানসির লি-দীনিল্লাহ ধারাবাহিক ৬০ বছর উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন উবায়দিয়া সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শাসক। তার আমলে উবায়দিয়া সাম্রাজ্য 'মুস্তালিয়া' ও 'নিযারিয়া' দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

৪৩২ হিজরী মুতাবেক ১০৪১ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের উত্তর ও ইরানের পূর্বে জ্বলে ওঠে নতুন আলো। এ আলোই ছিল সালজুক সাম্রাজ্য-এর আত্মপ্রকাশ। এ ছিল বিরাট সুন্নী সাম্রাজ্য। প্রসিদ্ধ তুর্কী বীর সালজুক ইবনে দূক্কাক্ব এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

৪৬৩ হিজরীতে সুলতান আল্প আরসালানের নির্দেশে তুর্কী সেনাপতি আতসিয ইবনে উভাক উবায়দিয়দের হাত থেকে ফিলিস্তিন উদ্ধার করেন। তবে এই সেনাপতি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করে সেলজুক শাসন থেকে আলাদা হয়ে যান। একপর্যায়ে আল্প আরসালানের ছেলে তুতুশ ইতযিসকে পরাজিত ও হত্যা করেন। তিনি তার এক সেনাপতি আরতুক ইবনে আকসাবকে ফিলিস্তিনের দায়িত্ব দেন।

৪৭১ হিজরী থেকে ৪৮৯ হিজরী পর্যন্ত ধারাবাহিক ১৮ বছর আরতুক ইবনে আকসাব ফিলিস্তিন শাসন করেন। দীর্ঘ অপশাসনের পর এ সময়টি ছিল ফিলিস্তিনের ইতিহাসে খুবই উত্তম সময়। যদিও তুতুশ ইবনু আল্প আরসালান শামের শাসক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন জালেম প্রকৃতির শাসক, তবে ফিলিস্তিনের গভর্নর আরতুক ইবনু আকসাব ছিলেন একজন আল্লাহভীরু ন্যায়পরায়ণ প্রজাদরদী শাসক। আরতুক ইবনু আসাব-এর মৃত্যুর পর তার সন্তানগণ ফিলিস্তিনের গভর্নর হন। তাদের একজনের নাম ছিল সুকমান। আরেকজনের নাম গাজী। তারা উভয়ই ছিলেন আল্লাহভীরু শাসক।

৪৮৯ হিজরীতে আবার উবায়দীয়রা ফিলিস্তিন দখল করে নেয়। তারা সুকমান ইবনে আরতুক ও গাজী ইবনে আরতুককে ফিলিস্তিন থেকে বের করে দেয়। এ দখল ধারাবাহিক ৩ বছর অব্যাহত থাকে।

এদিকে সুকমান ও গাজী পরাজিত এবং ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে হিজরত করেন। অঞ্চলটি ছিল দজলা ও ফুরাত নদীর কাছে অবস্থিত। অর্থাৎ তারা তুরস্কের দক্ষিণে হিজরত করেন। সেখানে গিয়ে আরাতিকা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে ইসলামী জিহাদে এ রাজ্যের ছিল বিশেষ অবদান।

যাইহোক, ফিলিস্তিন আবার ফিরে আসে উবায়দীয়া সাম্রাজ্যের দখলে। আবার সুন্নী আলেমদের উপর হত্যাযজ্ঞ এবং সুন্নতের উপর নির্বিচারে ত্রাস শুরু হয়। দেশের অবস্থা আবার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে।

ক্রুসেডারদের কবলে ফিলিস্তিন

খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের আগ্রাসনের কবলে পড়ে উবায়দীয়রা।

৪৯০ হিজরী মুতাবেক ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচটি বাহিনী ফ্রান্স থেকে কন্সটান্টিনোপলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়। ক্রুসেডার বাহিনী সর্বপ্রথম এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করে। তারা কিলিজ আরসালানকে খুব সহজে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। কেননা, কিলিজ আরসালান তখন ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। বরং তিনি গাজী ইবনু দানেশমান্দ মুসলিমের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। তখন সালজুক সাম্রাজ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। তাছাড়া উবায়দী শিয়াদের দীর্ঘ গোমরাহীপূর্ণ শাসন মুসলিম চেতনাকে মিইয়ে দেয়। এসব কিছু ক্রুসেডারদের জন্য ফিলিস্তিন প্রবেশ সহজ করে দেয়।

৪৯২ হিজরীতে অর্থাৎ ৭ জুন ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ ক্রুসেডার বাহিনী আল-কুদস পৌঁছে। পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত তারা আল-কুদস শহরে অনবরত অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু তারপরও কোনো বাহিনী এই মহান শহরের পবিত্রতা রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। অবশেষে ১৫ জুন, ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দ, মুতাবেক ২০ শাবান ৪৯২ হিজরীতে আল-কুদসের পতন ঘটে এবং মানব-ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা বাস্তবায়নের জন্য ক্রুসেডার বাহিনী ঘোড়ায় চড়ে মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে। তারা নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে ৭০ হাজার মুসলমানকে জবাই করে। পবিত্র শহরে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। ইহুদীদেরকে গির্জায় একত্রিত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।
এক বর্ণনায় এসেছে, তখন এত মানুষ শহরজুড়ে হত্যা করা হয় যে, সৈনিকদের ঘোড়ার গোড়ালি পর্যন্ত রক্তে ডুবে গিয়েছিল। মসজিদে আকসাকে ক্রুসেডাররা ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করে।

এ পর্যায়ে এসে মুসলিম বিশ্বে বেশ কয়েকটি ক্রুসেড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫০৭ হিজরী মুতাবেক ১১১৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের বড় একটি যুদ্ধে মওদুদ ইবনে তুনতাকিন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন।
এ যুদ্ধেই আত্মপ্রকাশ ঘটে ইতিহাসখ্যাত বীর ইমাদুদ্দীন জিনকির। তখন তিনি ছিলেন তিনি হলেন ইতিহাসখ্যাত বীর ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। তখন তিনি ছিলেন মাত্র ২৪ বছরের তরুণ যুবক। তিনি ইসলামী ভূখণ্ডগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একে একে মুসলিম বিশ্বে গজিয়ে ওঠা ক্রুসেড রাজ্যগুলোকে পরাজিত করেন। এভাবেই গড়ে ওঠে জিনকি সাম্রাজ্যের ভিত্তি। ৫৪১ হিজরীতে তিনি আততায়ীর হাতে শহীদ হন। তার অসমাপ্ত মিশন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসেন পুত্র নুরুদ্দীন জিনকি। নুরুদ্দীন রাহ. ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনেকগুলো বিজয় অর্জন করেন। ৫৪৮ হিজরীতে

দুঃখজনকভাবে আসকালান ক্রুসেডারদের দখলে চলে যায়। আসকালান ছিল ফিলিস্তিনের একমাত্র স্বাধীন মুসলিম অঞ্চল। যদিও সেখানের শাসক ছিল উবায়দীয়রা। তারা নুরুদ্দীন রাহ.-এর কাছে সাহায্যের আবেদন পাঠালে তিনি প্রথমে দামেশক জয় করেন। তবে ফিলিস্তিন জয় করতে প্রয়োজন ছিল মিশরের বিজয়। আল্লাহ তাআলা সে ব্যবস্থাও করে দেন। মুসলিম বিশ্বের এক বিস্ময়কর ব্যক্তি হিসেবে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর আবির্ভাব ঘটে। তিনি ৫৬৭ হিজরী ২০৮ বছরের উবায়দী শাসনের বিলুপ্তি ঘটান। পরবর্তীতে উবায়দীয়রা ক্রুসেডারদের সঙ্গে আতাত করে বহুবার মিশর দখল করতে চাইলেও প্রতিবারই তা ব্যর্থ হয়। এর মাত্র ২ বছর পর নুরুদ্দীন রাহ. দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

নুরুদ্দীন রাহ.-এর মৃত্যুর পর জিহাদের হাল ধরেন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী। তিনি বিভক্ত মুসলিম রাজ্যগুলোকে একীভূত করেন। ৫৮৩ হিজরীতে হিত্তীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ক্রুসেডারদের তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। এই যুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কল্পনাতীতভাবে মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। হিত্তীন বিজয়ের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ক্রুসেডারদের দখল থেকে বিভিন্ন শহর জয় করেন। এরপর তিনি লেবানন অভিমুখে রওয়ানা হন। লেবাননের অর্ধেক তখন বাইতুল মাকদিস রাজ্যের অধীনে ছিল। তিনি দুই মাসেরও কম সময়ে আল কুদস বাদে ফিলিস্তিনের সব অঞ্চল জয় করে ফেলেন।

সালাহউদ্দীন আইয়ুবী রাহ.-এর আল কুদস বিজয়

৫৮৩ হিজরীর ১৫ রজব সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আল-কুদস অবরোধ করে শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তর করার আহ্বান জানান। কিন্তু আল-কুদসের পাদ্রী তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। বাধ্য হয়ে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী শহরের চারপাশে মিনজানিক স্থাপন করে টানা ১২ দিন পর্যন্ত অবরোধ, আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। তখন ক্রুসেডাররা হামলার ভয়াবহতা দেখে সালাহুদ্দীনের কাছে শান্তি-প্রস্তাব পেশ করে। প্রথমে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও পরে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, বাইতুল মাকদিস হস্তান্তরের পর জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

২৭ হিজরী রজব মাসে আলকুদস শহর মুসলমানদের হাতে আসে। ক্রুসেডাররা মসজিদে আকসাকে এতটাই অপরিচ্ছন্ন করেছিল যে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পুরো এক সপ্তাহ লেগে যায়। এরপর তারা মাসজিদুল আকসায় সালাত আদায় করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এ বছর ঈদুল আযহা আল-কুদসে উদযাপন করেন।

৫৮৫ হিজরীর রজব মাসের মাঝামাঝি গাই ডি লুসিগনান তার ক্রুসেডার বাহিনী নিয়ে সুরের নিকটবর্তী ফিলিস্তিনী শহর আক্কা অভিমুখে রওয়ানা করে। লুসিগনানকে ফ্রান্সে চলে যাওয়ার শর্তে সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আট মাস বন্দি রাখার পর মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ওয়াদা ভঙ্গ করে এবং সুরে গিয়ে পরাজিত ক্রুসেডারদের সঙ্গে মিলিত হয়। তার এই প্রতারণায় সালাহুদ্দীন আইয়ুবী খুবই ক্ষিপ্ত হন। তিনি আক্কা শহর রক্ষা করার জন্য বাহিনী নিয়ে আক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি একটি অগ্রবর্তী বাহিনীও পাঠিয়ে দেন, যাতে তারা ক্রুসেডারদের আগেই আক্কায় পৌঁছতে পারে। এই অগ্রবর্তী দল ক্রুসেডারদের আগেই আক্কা পৌঁছে যায়। তারা শহরে প্রবেশ করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে অবস্থান নেয়। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নেতৃত্বে মুসলমানদের বাহিনীর মূল শক্তি পৌঁছার আগেই ক্রুসেডাররা পৌঁছে যায় এবং তারা আক্কা শহর চর্তুদিক থেকে অবরোধ করে। ক্রুসেডারদের কৌশলগত অবস্থান ও বিপুল শক্তিমত্তার দরুন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ব্যর্থ হন। পূর্ণ দুই বছর অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানরা ক্রুসেডারদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।
এর মধ্যে বাইতুল মাকদিসে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করার জন্য ইউরোপে বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টি হয়। আক্কা শহর ক্রুসেডারদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার পর ইয়াফা, আসকালান, কায়সারিয়া, আরসোফ, হাইফা ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। ২৭ সফর ৫৮৯ হিজরীতে মহাবীর সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যু শুধু মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসের একজন মহান নেতাকে হারানোর বিপর্যয়ই ছিল না; বরং তার মৃত্যুপরবর্তী সময়ে মুসলিম জাতি কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ক্ষমতা নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মুসলমানদের পারস্পরিক বিবাদের ৯ বছর

পর সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর ভাই আদিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। এরই মধ্যে ক্রুসেডারদের হাতে বৈরুতের পতন ঘটে। ৫৯৯ হিজরীতে চতুর্থ ক্রুসেড অভিযান পরিচালিত হয় এবং তা লক্ষভ্রষ্ট হয়। ক্রুসেডাররা আলকুদসের পরিবর্তে বাইজান্টাইনদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। তারা স্বজাতির ওপর হত্যা ও লুটতরাজ চালায়। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়।

আদিল ৫৯৮ থেকে ৬১৫ হিজরী পর্যন্ত মুসলিমবিশ্ব শাসন করেন। তিনি এ দীর্ঘ সময়ে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে কোনো চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করেননি। ইসলামী সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আদিলের সমস্ত মনোযোগ ছিল রাজ্য সুবিন্যস্ত করার প্রতি। ফলে ৬১৫ হিজরীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের উপর পরিচালিত হয় পঞ্চম ক্রুসেড অভিযান। এ অভিযান ছিল খুব শক্তিশালী। অভিযানের কথা শুনে আদিল সাথে সাথে মিশর ছেড়ে ফিলিস্তিন রক্ষার্থে ছুটে আসেন। ক্রুসেডারদের বিপুল সংখ্যার কথা শুনে তিনি সৈন্য সংগ্রহের জন্য দামেশকে যান। এসময় দামেশকে আদিলের ইন্তেকাল হয়। এতে ক্রুসেডাররা মিশর দখল করে। আদিলের মৃত্যুতে মিশরের অভ্যন্তরে এবং ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মানসূরার সীমান্তে ইসলামী শক্তি ও ক্রুসেডারদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কামিল ক্রুসেডারদের কাছে অত্যন্ত ঘৃণ্য এক প্রস্তাব পেশ করেন। যাতে বলা ছিল ক্রুসেডাররা দিময়াত ছেড়ে চলে গেলে আল কুদসসহ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বিজিত সব অঞ্চল তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে তবে কার্ক ও শোবাক অঞ্চল এই শর্তের বাইরে থাকবে। তারা এই শর্ত মেনে না নেওয়ায় দুই পক্ষের মাঝে যুদ্ধ লেগে যায়। এমন অপমানকর প্রস্তাবের পরও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন, ফিলিস্তিনকে হেফাজত করেন। পরাজয়ের মুখে ক্রুসেডাররা কোনোরকমে জীবন বাঁচিয়ে দেশে চলে যায়।

৬২৪ হিজরীতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের নেতৃত্বে ষষ্ঠ ক্রুসেড পরিচালিত হয়। মাত্র ৫০০ যোদ্ধা নিয়ে সে অভিযানে বের হয় তারা। দুর্বলচিত্তের শাসক কামিল যুদ্ধে না জড়ানোর জন্য আল কুদস ক্রুসেডারদের হাতে সোপর্দ করে। তবে শর্ত ছিল আলকুব্বাতুসা সাখরা ও আলআকসা মসজিদ তাদেরকে দেওয়া হবে না। মাত্র ৫০০ সৈন্য নিয়ে ৬২৫ হিজরীতে দ্বিতীয় ফ্রেডরিক আলকুদস বুঝে নেয়। কামিল ৬১৫ থেকে ৬৩৫ হিজরী পর্যন্ত ২০ বছর শাসন করেন। সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কুদস বিজয়ের ৪৩ বছর পর এভাবেই আবার কুদসের পতন ঘটে।

৬৩৭ হিজরীতে নাজমুদ্দীন আইয়ুব শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নেককার শাসক। তিনি সবকিছু নতুন করে ঢেলে সাজান। এসময় নাজমুদ্দীনের ভাতিজা ইসমাঈল দামেশকের ক্ষমতায় বসেন। ৬৩৭ হিজরীতে আন-নাসির দাউদ নিজের বাহিনী নিয়ে আল-কুদসে অভিযান চালান এবং ক্রুসেডারদের থেকে আল-কুদস ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন। তবে তার এই আল-

কুদস দখল ইসলামী বিশ্বকে ক্রুসেডারদের হাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং ছিল শুধু নিজের রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য। এভাবে কামিলের আল-কুদস হস্তান্তরের ১২ বছর পর তিনি আল-কুদস থেকে ক্রুসেডার শাসনের অবসান ঘটান। আন-নাসির দাউদ আল-কুদস দখল করতেই ইসমাঈল তার কাছে এসে উপস্থিত হন। তিনি দাউদের কাছ থেকে আল-কুদস ছিনিয়ে নিয়ে ক্রুসেডারদেরকে সোপর্দ করে দেন, এমনকি কুব্বাতুস সাখরা ও মসজিদুল আকসাও তাদেরকে দিয়ে দেন এই শর্তে যে তাকে মিশর দখলে ক্রুসেডাররা সহায়তা করবে। ৬৩৮ হিজরীতে দ্বিতীয় বারের মতো আল কুদস ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সুলতান নাজমুদ্দীন আইয়ুব ৬৪২ হিজরীতে আল কুদস পুনরুদ্ধার করেন। এরপর দীর্ঘ ৬৯৩ বছর ধারাবাহিক আল-কুদসে ইসলামী শাসন অব্যাহত থাকে। ১৩৩৫ হিজরীতে ব্রিটিশ-বাহিনীর আল কুদসে প্রবেশের মধ্য দিয়ে সেই ধারার অবসান ঘটে।
নাজমুদ্দীন আইয়ুবের কুদস জয়ের কথা শুনে ফরাসি সম্রাট নবম লুইসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক পোপ সপ্তম ক্রুসেডের ডাক দেন। এবারে ক্রুসেডাররা চরমভাবে পরাজিত হয়। ক্রুসেডারদের বিরাট সংখ্যক সৈন্য নিহত হয় এবং নবম লুইস বন্দী হয়।

নাজমুদ্দীন আইয়ুবের মৃত্যুর পর মিশরের ক্ষমতায় আসে মামলুকেরা। মামলুকদের শ্রেষ্ঠ শাসক সাইফুদ্দীন কুতুয মুসলিম বিশ্বের জন্য তাতারীদের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। তিনি গাজায় মোতায়েন করা তাতার বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করেন। ২৫ রমযান ৬৫৮ হিজরীতে আইনুল জালুতের প্রান্তরে তাতারদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা ঐতিহাসিক বিজয় লাভ করে।

সাইফুদ্দীন কুতুযের পর ক্ষমতা লাভ করেন যহীরুদ্দীন বাইবার্স। তিনি একসাথে একাধিক ক্রুসেড সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন সাইফুদ্দীন কালাউন। তিনিও ক্রুসেডারদের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। এরপর যারাই শাসন-ক্ষমতায় এসেছেন তারা প্রত্যেকেই ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। মুসলিম বিশ্বে গড়ে ওঠা সব ক্রুসেডারদেরকে উচ্ছেদ করেছেন। মুসলমান শাসনাধীনে ইহুদীরা সবচেয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছিল। ইহুদীদের সাথে এই ইসলামী উদারতার সমকালে ইউরোপ জুড়ে খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে চলছিল ইহুদী নিধন। কেবল খ্রিষ্টধর্ম গ্রহনের মাধ্যমেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিলো অন্যথায় দেশত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছিলো। তখন দলে দলে ইহুদীরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। তাদের এ ধর্মগ্রহণ ছিল কেবলই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য। এদের মাধ্যমেই জন্ম নেয় খ্রিষ্টীয় জায়নবাদের।

উসমানী শাসন ব্যবস্থার উত্থান

মামলুক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে উসমানী সাম্রাজ্যের উত্থান হতে থাকে। উসমান ইবনে আরতুগ্রুলের হাত ধরে এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উসমান ইবনু আরতুগ্রুলের জীবনে মূলমন্ত্র ছিল 'হয়তো গাজী, নয়তো শহীদ।' শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা মিলিয়ে ৬৪৩ বছর এই সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়।

মুহাম্মাদ আল ফাতিহ উসমানী সাম্রাজ্যের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সুলতান। তিনি ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ভু অঞ্চল উসমানী খিলাফতের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ৮৫৭ হিজরীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করেন। কনস্টান্টিনোপল বিজয় ছিল ইউরোপের ইতিহাসে পট পরিবর্তনের সূচনা। পাঁচশ বছর পর্যন্ত কনস্টান্টিনোপল ছিল উসমানী সাম্রাজ্যের রাজধানী। এসময় উসমানী খিলাফতে শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, রাষ্ট্রপরিচালনা, উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনা, শহর স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। বেলগ্রেড (Belgrade) শহর বাদে পুরো সার্বিয়া, রোমানিয়া ও বসনিয়ার দেশও জয় করেন। এছাড়াও গ্রিস, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো ও ইতালির অট্রান্টো (Otranto) শহরের কিছু অংশ জয় করেন। তার যামানায় বসনিয়ার অধিবাসীরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে। প্রায় ত্রিশ হাজার বসনীয় খ্রিস্টান যুবক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য উসমানী বাহিনীতে যোগদান করেন।

৯২২ হিজরীতে মার্জ দাবিক ময়দানে উসমানী ও মামলুক বাহিনীর মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উসমানী সুলতান প্রথম সেলিম বিজয়ী হন। মামলুক বাহিনী পর্যদুস্ত হয়। এ বিজয়ের পর সুলতান সেলিম একে একে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, লেবানন জয় করে নেন। এরপর মামলুকদের শেষ আশ্রয় মিশরও দখল করেন।

সুলতান সুলাইমান আল-কানুনী উসমানী সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সুলতানদের মধ্যে একজন ছিলেন। তার শাসনামল ছিল উসমানী খিলাফতের সর্বোচ্চ শক্তির যুগ। তার শাসন ব্যাপ্তি লাভ করে ৪৮ বছর। উসমানী খিলাফত তখন দুনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তিনি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি আল-কুদসের প্রাচীর নির্মাণ করেন, কুব্বাতুস সাখরা মসজিদ সংস্কার করেন। তিনি সুলতান প্রথম সেলিমের প্রণীত "ফিলিস্তিনের কোথাও ইহুদীরা বসবাস করতে পারবে না" এই আইন বহাল রাখেন। ইহুদীরা উসমানী খিলাফতের অভ্যন্তরে যেকোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে; তবে ফিলিস্তিন বাদে।

সুলতান সুলাইমানের মৃত্যুর পরেই শুরু হয় উসমানীয় শাসনের পতনের সূচনা।

উসমানী শাসন ব্যবস্থার পতনের সূচনা

ইউরোপ থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উসমানী খিলাফতে। দীর্ঘকাল তারা সেখানে বসবাস করে।

উসমানী সাম্রাজ্যের সুলতান, দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের শাসনামলের শুরুতে রাশিয়ায় ইহুদীদের উপর চরম দমন-নিপীড়ন চলছিল। তখন ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সুলতান আব্দুল হামীদকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদের গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে তিনি ইহুদীদের মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে ইহুদীরা কিছুতেই ফিলিস্তিনে বসবাস করতে পারবে না, এ ব্যাপারে তিনি খুব কঠোর ছিলেন।

একপর্যায়ে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরে ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হস্তক্ষেপ করতে থাকে। তখন সুলতান আব্দুল হামীদ অত্যন্ত চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন, 'যতদিন উসমানী খেলাফত থাকবে, ততদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীরা ঠাঁই পাবে না।'

১২৯৯ হিজরীতে (১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে) ইংল্যান্ড মিশর দখল করে ফিলিস্তিন থেকে মিশরকে আলাদা করে ফেলে। এই আগ্রাসন ছিল ফিলিস্তিনে ইহুদীদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা।

খলীফা আব্দুল হামীদের আমলেই 'তুর্কী যুব সংঘ' গড়ে ওঠে। যাদের ছিল 'ঐক্য ও প্রগতি' নামে তাদের সামরিক ফ্রন্ট। উসমানী সেনাবাহিনীর বিরাট একটি অংশকে তারা নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। তাদের সঙ্গে ছিল ডোনমে ইহুদীরাও। আরব বিশ্বেও তখন জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়িয়ে পড়ে। একইসাথে হার্জেল নামক এক ইহুদী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর কাছে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য লবিং করতে থাকে। সে সুলতান আব্দুল হামীদের কাছে গিয়েও ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জমি দেওয়ার আবেদন করে। সুলতানকে অনেক প্রলোভনও দেখায়। সুলতান আব্দুল হামীদ তাকে প্রত্যাখ্যান করে মনোমুগ্ধকর কিছু কথা বলেন। তিনি বলেন, "হার্জল যেন এ বিষয়ে আর এক কদমও সামনে না বাড়ে। আমি দেশের এক ইঞ্চি মাটিও বিক্রি করতে পারব না। কারণ, তা আমার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়; বরং জাতির সম্পদ। এ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাতির রক্তের বিনিময়ে। আমরা আমাদের রক্ত দিয়ে তা সিঞ্চিত করব। তবুও তা ছিন্ন-ভিন্ন হতে দিব না।"

সে রুশ সম্রাট জারের কাছে গিয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে সে উসমানী খেলাফত ও রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়ার ফন্দি আঁটতে থাকে।

১৯০৯ সালে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ সুলতান আব্দুল হামীদকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। নামকাওয়াস্তে খলীফার আসনে বসানো হয় পঞ্চম মুহাম্মাদকে। ব্যক্তিত্বহীন এ মানুষটি ছিল কেবলই খেলাফত বিলুপ্তির মাধ্যম।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪-১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। শত্রু-মিত্র নির্ণয়ের জটিল প্রক্রিয়া, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, উপনিবেশিক বাসনা ও সরকারগুলোর উচ্চপর্যায়ে অব্যবস্থাপনা সবকিছু মিলিয়ে সৃষ্টি হয় এক প্রলয়ঙ্কারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মিত্রশক্তি ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া (পরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইতালি যোগ দেয়) এবং কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, উসমানী সাম্রাজ্য এবং বুলগেরিয়া। **১৯১৪** থেকে **১৯১৮** সাল পর্যন্ত চলমান এই যুদ্ধে অসংখ্য লোক প্রাণ হারায়, আহতের সংখ্যাও ছিল অগণিত।

প্রথমদিকে উসমানী খিলাফত যুদ্ধে না জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইংল্যান্ডের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে ঐক্য ও প্রগতি সংঘ উসমানী সাম্রাজ্যকে এই যুদ্ধে ঠেলে দেয় উসমানী সাম্রাজ্যের শক্তি সমূলে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য। এই সাম্রাজ্যকে তারা জার্মানির পক্ষে দাঁড় করিয়ে দেয়। আর নিজেরা অবস্থান নেয় অপর পক্ষে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। এরপর আমেরিকাও তাদের সাথে যুক্ত হয়। এরপর ইতালিও তাদের সাথে এই শর্তে যোগ দেয় যে, বিনিময়ে তাকে লিবিয়া প্রদান করতে হবে। বাস্তবেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ইতালিকে লিবিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোতে ইউরোপে ছড়িয়ে থাকা উসমানী সেনাবাহিনীতে মড়ক দেখা দেয়। এজন্য তারা পরাজিত হতে থাকে। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সহায়তায় সার্বিয়া ও গ্রিসে উসমানী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিপ্লব কায়েম হয়। ফলে উসমানী সামরিক শক্তি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। তখনো ফিলিস্তিনে উসমানী বাহিনীর **১** লাখ সৈন্য মোতায়েন ছিল। এতে বোঝা যায়, উসমানী খেলাফত ফিলিস্তিনকে কতটা গুরুত্ব দিত। দুঃখের বিষয় হল, এ বিপুল সৈন্যের নেতৃত্বে ছিল মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক, যার হাতে **১৯২৪** সালে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতের পতন ঘটে।

বেলফোর ঘোষণা

আমেরিকা ও ব্রিটেন মিত্রশক্তির নেতৃত্বে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ স্থায়ী হওয়ায় ব্রিটেনে অর্থসংকট দেখা দেয়। ব্রিটেনের সাহায্যে ইহুদীরা তখন নিজেদের ধনভান্ডার উজাড় করে দেয়। এর বিনিময়ে ফিলিস্তিনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন তাদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা করার শর্তে ইহুদীদের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সেসময় জায়নবাদী সংস্থাগুলোর প্রধান কার্যালয় ছিল ইংল্যান্ডে। এদিকে ধনাঢ্য ইহুদীদের সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ রাজপরিবারের ছিল যথেষ্ট সখ্যতা। যুদ্ধের সমাপ্তিতে ব্রিটিশরা বিজয়ী হলে ইহুদীরা আশার আলো দেখতে পায়। **১৯১৭** খ্রিষ্টাব্দের ২ নভেম্বর ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী 'আর্থার বেলফোর' (Arthur Balfour) ব্রিটেনে বসবাসরত ইহুদী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান রথসচাইল্ডের নামে একটা চিঠি পাঠায়। সেই চিঠিতে জায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, 'ব্রিটেন সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত।' পরে এই ঘোষণাকেই বেলফোর ঘোষণা (Balfour Declaration) বলে অভিহিত করা হয়।

এই ঘোষণায় ফিলিস্তিনী মুসলিম নাগরিকদেরও অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি, এটা ছিল মূলত মুসলিমদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদকে থামিয়ে দেওয়ার কৌশল। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বিজয়ের পর ইংরেজরা **১৯১৭** খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল এলএনবির নেতৃত্বে ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। **১৯১৭** খ্রিষ্টাব্দের **৯** ডিসেম্বর তারা ফিলিস্তিন দখল করে। জার্মান ও তুর্কি বাহিনী সিরিয়ার দিকে চলে যাওয়ায় তখন থেকে ফিলিস্তিনে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ ও ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ও ফিলিস্তিন ছিল উসমানী সাম্রাজ্যের অংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানীয়রা পরাজিত হলে ফিলিস্তিন ব্রিটিশদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন থেকে ইহুদীরা একটি আলাদা রাষ্ট্র (তাদের ভাষায় Jewish National Home) গঠনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। এদিকে পর্যাপ্ত ইহুদী ফিলিস্তিনে না থাকায় ব্রিটিশরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদীদের ফিলিস্তিনে নিয়ে আসে এবং ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করতে থাকে। ফিরে আসা ইহুদীরা ব্রিটিশদের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করতে গড়ে তোলে প্রশিক্ষিত একাধিক গোপন সংগঠন। এর মধ্যে তিনটি প্রধান সংগঠন ছিল হাগানা, ইরগুন ও স্ট্যার্ন গ্যাং। যারা হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ আর ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টির মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের বাধ্য করে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে, এভাবে ফিলিস্তিনিদের জমিজমা ইহুদীরা দখল করে নেয়। এর সঙ্গে সমানতালে চলতে থাকে ইহুদী বসতি নির্মাণ ও মুসলিমদেরকে ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদকরণ। এসব তৎপরতার ফলস্বরূপ স্বল্পসময়ে ২০ হাজার থেকে বহিরাগত ইহুদীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫ লাখ ৪০ হাজারে।

১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইঙ্গ-মার্কিন চাপে জাতিসংঘে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ৩৩টি রাষ্ট্র পক্ষে, ১৩টি বিরুদ্ধে এবং ১০টি ভোট দানে বিরত থাকে। প্রস্তাব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয়েও ইহুদীরা পায় ভূমির ৫৭%, ফিলিস্তিনরা পায় ৪৩%। প্রস্তাবিত ইহুদী রাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিম সীমানা অনির্ধারিত রাখা হয় যাতে ভবিষ্যতে ইহুদীরা সীমানা বাড়াতে পারে। জাতিসংঘের মাধ্যমে এভাবে পাস হয় একটি অবৈধ ও অযৌক্তিক প্রস্তাব। জাতিসংঘের রায়ের পর ফিলিস্তিনিরা গাজা নামক শহরের উপকণ্ঠ উত্তর-দক্ষিণে বসবাস শুরু করে। আর ইহুদীরা ফিলিস্তিনের উত্তর-পশ্চিমে বসবাস করতে শুরু করে। যেহেতু উত্তর-পশ্চিমে তাদের বসবাসের সীমানা নির্ধারিত ছিল না, তাই এমন প্রহসনের নাটকে জিতে গিয়ে ইহুদীরা হয়ে উঠে আরো হিংস্র। তারা মুসলমানদের সেখান থেকে সমূলে বিতাড়িত করে ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে হত্যা-সন্ত্রাসের পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদে ফোন লাইন কেটে, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে, ঘর-বাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ বা জোর-জবরদস্তি জমি দখল ও বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতন করে মৃত্যুর বিভীষিকা সৃষ্টি করে সন্ত্রাসীরা। ফলে লাখ লাখ মুসলমান বাধ্য হয় দেশ ত্যাগে। তারা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ লেবানন ও মিশরে পাড়ি জমিয়েছিল। আর ইসরাইল বাহিনী এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেদের সীমানা বাড়িয়েই চলছিল।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ব্রিটিশ সরকার ফিলিস্তিনের দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে সৈন্যদের বের করে নিলে সেদিনই তেলআবিব শহরে ইহুদী জাতীয় পরিষদ গঠিত হয় এবং ঘোষণা দেওয়া

হয় ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। পূর্ব যোগাযোগ অনুসারে ১০ মিনিটের ব্যবধানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান নতুন 'ইসরাইল রাষ্ট্রকে' স্বীকৃতি দেয়।

নানা ঘটনা-পরিক্রমা শেষে ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ইহুদীরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। আর তখন থেকেই শুরু হয় ইহুদীদের তাণ্ডবলীলা। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনকে ভেঙে কৌশলে ইসরাইল নামক যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়, তা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ীই অবৈধ ছিল। জন্মের পর থেকেই ইসরাইল আঞ্চলিক শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও তড়িৎ স্বীকৃতি

১৯৪৮ সালের ১৪ মে ডেভিড বেনগুরিয়ন ইসরাইলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ১০ মিনিটের মাথায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান একে একটি 'রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেন। পরেরদিন এই 'স্বাধীনতাকে' স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানায়। আমেরিকা ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স এবং সোভিয়েত ইউনিয়নসহ মোট ৩৩টি দেশ ইসরাইলকে 'রাষ্ট্র' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৩টি দেশ এর বিরোধিতা করেছে। এই ১৩টি দেশই ছিল মুসলিম।

পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে বসবাসের জন্য স্বতন্ত্র কোনো দেশ থাকবার নজির নেই। একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকা থেকে জড়ো করা হয়েছে ইহুদীদেরকে, বৃদ্ধি করা হয়েছে তাদের সংখ্যা। এমন ঘটনা ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বীকৃতি পেয়েই ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে জায়নবাদী সন্ত্রাসীরা দেইর ইয়াসিন ও কাফার কাসেম গ্রামে গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যার পর নিরাশ্রয়ী ও বাস্তুহারা ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে তারা প্রাণভয়ে পালাতে থাকে জর্ডান সীমান্তের ওপারে। একই সময় আরবদেশগুলোর সৈন্যবাহিনী ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় মাঠে নামে। কিন্তু তাদের সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ইসরায়েলি সন্ত্রাসীদের মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ইহুদীদের ছিল ইউরোপ-আমেরিকার নিরবিচ্ছিন সমর্থন ও বিরামহীন জঙ্গিবিমান-সমরাস্ত্রের যোগান।

১৯৪৮ সালের যুদ্ধে প্রায় দশ লাখের অধিক ফিলিস্তিনি মুসলমান বাস্তুহারা হন। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদী অঞ্চলে বিভক্ত করে জেরুজালেম আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রস্তাব করলে ইসরাইল তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এসব অধিকারহীনতার পর ফিলিস্তিনিদের মাঝে বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপ ও প্রতিরোধী সংগঠন গড়ে ওঠে। ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে তাদের সামনে এছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না । ১৯৬৪ সালের ২৮ মে আল-কুদস শহরে অনুষ্ঠিত হয় ফিলিস্তিনি কংগ্রেস। এই কংগ্রেসেই ফিলিস্তিন লিবারেশন অরগানাইজেশন (পিএলও) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইয়াসির আরাফাতের আল-ফাতাহ পিএলও-য় যোগ দিলে দলটি এর সামরিক বাহিনীতে রূপ নেয়। তবে এসবের কোনো কিছুই ইহুদীদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের মুক্তির সংগ্রামে আশানুরূপ ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুসলমান স্বদেশের মুক্তির পথে জীবন দিয়েছেন। অথচ তখনো পর্যন্ত ইহুদীরা ছিল ফিলিস্তিনের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী যদিও তারা বিরামহীন অভিবাসন ও নিরবিচ্ছিন মুসলিম উচ্ছেদে মেতে ছিল।

১৯৬৭ সালের ছয়দিনের যুদ্ধ

১৯৬৭ সালের ৫ জুন সন্ত্রাসবাদী ইসরাইল অতর্কিতে মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের বিমানবন্দরে আক্রমণ চালিয়ে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধে জর্ডান-নদীর পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা, সিরিয়ার গোলান মালভূমি ও মিশরের সিনাই মরু এলাকা ইসরায়েলিরা দখল করে নেয়। আরব- ইসরাইলের এ যুদ্ধটি ছয়দিনের যুদ্ধ বলে পরিচিত। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইসরাইলের সাথে সম্মুখ যুদ্ধের সাহস হারিয়ে ফেলে আরব জাতীয়তাবাদীরা। ফলে আরব রাষ্ট্রগুলো বৃহৎ শক্তির লেজুড়বৃত্তি ও আলাপ-আলোচনাকে প্রাধান্য দিতে থাকে। ছয়দিনের যুদ্ধের পর জাতিসংঘ ইশতেহার পাস করে ইসরাইলকে জবরদখলকৃত এলাকা থেকে পিছিয়ে আসার আহ্বান জানায়। কিন্তু ইহুদীরা তাতে মোটেও কর্ণপাত করেনি। উল্টো জর্ডানের হাতে ন্যস্ত বায়তুল মাকদিস সহ জেরুজালেম শহর, বেথেলহাম (বায়তুল লাহাম) এবং আরো ২৭টি ফিলিস্তিনি গ্রাম দখলপূর্বক ইসরাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে ঘোষণা দেয় তারা। জায়নবাদীরা বায়তুল মাকদিসে ইহুদী সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখানকার ইহুদী জনসংখ্যা তিন হাজার থেকে বাড়িয়ে এক লাখ নব্বই হাজারে পৌঁছায়। ১৯৬৯ সালের ১১ আগস্ট ইহুদীরা মাসজিদুল আকসায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে বলে, বৈদ্যুতিক বিভ্রাটে আগুন লেগেছে। এসময় অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকহারে নির্মিত হতে থাকে ইহুদী বসতি।

১৯৬৯ সালে পুরাকীর্তি, প্রাচীন শিলালিপি ও আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং প্রাচীন জাতি-সভ্যতার নিদর্শনাদি খোঁজার অজুহাতে তারা কুব্বাতুস সাখরা ও মাসজিদে আকসার আশেপাশে খনন কাজ শুরু করে। এর একটি সম্ভাব্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাসিন্দাদেরকে এই দুটি পবিত্র মসজিদ সংলগ্ন এলাকা থেকে উচ্ছেদ করে এসব ঐতিহাসিক স্থাপনা ধ্বংস করে নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো গড়ে তোলা। ইহুদীরা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ইউরোপের মদদপুষ্ট হয়ে ক্রমান্বয়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে এবং আরববিশ্ব ও জাতিসংঘের কথিত বিরোধিতা সত্ত্বেও বায়তুল মাকদিস অর্থাৎ জেরুজালেমকে ভবিষ্যত রাজধানীর ঘোষণা দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ফিলিস্তিনের বর্তমান অবস্থা

১৯৪৮ সালে জন্ম নেওয়া অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তাদের আগ্রাসনের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ফিলিস্তিনিদেরকে নিজের জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের ভূখণ্ডে ইহুদী বসতি স্থাপন করেছে সন্ত্রাসী ইহুদী বাহিনী। তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার, গণহত্যা চালাচ্ছে যা এখনো পর্যন্ত চলমান। নিরুপায় হয়ে ইসরাইলের হামলার বিপরীতে ফিলিস্তিনিরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইসরায়েলি আগ্রাসন ফিলিস্তিনিদের জীবনকে করে তুলেছে দুর্বিষহ, মানবেতর জীবনযাপন করছে অসহায় ফিলিস্তিনবাসী।

রমজান যুদ্ধ বা ইয়ম কিপুর যুদ্ধ

১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধে জর্ডান-নদীর পশ্চিম তীর, গাজা উপত্যকা, সিরিয়ার গোলান মালভূমি ও মিশরের সিনাই মরু এলাকা দখলের পর থেকেই ইহুদীদের আগ্রাসন বাড়তে থাকে। তাদের এই আগ্রাসনের পর **১৯৭৩** সালে মিশরের সামরিক বাহিনী অতর্কিত সুয়েজ অতিক্রম করে ইসরাইলের বারলেভ প্রতিরক্ষা লাইন ভেঙে ফেলে এবং সিনাই মরুভূমি ও দখলকৃত ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। পূর্বদিক থেকে একই সময় সিরিয় বিমানবাহিনী ইসরাইলের ওপর হামলা চালায় যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনে ইহুদীদের শত শত জঙ্গিবিমান ও সাঁজোয়া ধ্বংস করে। নিহত হয় কয়েক হাজার ইসরায়েলি। পরবর্তীতে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের দ্রুত সামরিক সহায়তা ও সরাসরি অংশগ্রহণ এবং সিরিয় সেনাবাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধের গতি ইহুদীদের পক্ষে মোড় নেয়। অন্য কোনো আরবদেশও এই যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা না রাখায় নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে মিশর। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী সিরিয়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং সুয়েজ খাল অতিক্রম করে এবং তার পশ্চিম তীরে বাহিনী স্থাপন করে মিশরীয় সেনাবাহিনীকে ঘিরে ফেলে। অবশেষে ক্রুসেডার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় কায়রো থেকে **৬০১** কিলোমিটার দূরত্বে যুদ্ধাবসানের জন্য আলোচনা শুরু হয় এবং সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অবসান ঘটে এই যুদ্ধের। আরব-ইসরাইলের এই যুদ্ধ অক্টোবর যুদ্ধ বা রমজান যুদ্ধ বা ইয়ম কিপুর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

ফিলিস্তিনে ইহুদী দখলদারী প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ হলো রমজান যুদ্ধ। **১৯** দিনব্যাপী স্থায়ী এই যুদ্ধে **৩** হাজারের অধিক ইহুদী সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং আহত হয় **৯** হাজারের মতো।

'ইন্তিফাদা'

১৯৮৭ সালের হেমন্তে অধিকৃত ফিলিস্তিনি জনসাধারণ ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থানের সূচনা ঘটান- যার নাম দেওয়া হয় ইন্তিফাদা। ইন্তিফাদা অর্থ 'নাড়া দেওয়া, নড়ে ওঠা, ঝাঁকুনি দেওয়া'। পাখি যেমন গোসল সেরে ভেজা শরীর হালকা করা ও আকাশে উড়বার জন্য পাখা ঝাঁপটায়, এমন ধরনের নাড়াকে বলে ইন্তিফাদা। ইন্তিফাদার পূর্বপর্যন্ত সমস্ত আন্দোলন ও অভ্যুত্থান ছিল বিশেষ কোনো দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিন্তু ১৯৮৭'র ইন্তিফাদার আগে-পরে কোনো বিশেষণ যুক্ত হয়নি। এই ইন্তিফাদা ১৯৮৭ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই ইন্তিফাদা ছিল ফিলিস্তিনি জনগণের গণপ্রতিবাদ বা গণঅভ্যুত্থান। ইন্তিফাদার সূচনা হয়েছিল গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সেনা ট্যাঙ্ক পরিবহনকারীর ধাক্কায় ফিলিস্তিনিদের এক পরিবারের ৪ সদস্য নিহত হওয়ার পর। তখন তরুণ ফিলিস্তিনিরা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক ও সৈন্যদের দিকে ঢিল ছুঁড়লে বিক্ষোভ দ্রুত পশ্চিম তীরে ছড়িয়ে পড়ে। এর পরপরই বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভে সাধারণ জনতার অংশগ্রহণের মাত্রা ছিল অভূতপূর্ব। নারী, শিশুসহ হাজার হাজার বেসামরিক জনগণ এতে শামিল হয়। ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, জল কামান, রাবার বুলেট, এবং গোলাবারুদ নিয়ে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিন্তু বিক্ষোভ আরও বেগবান হয়। জবরদখল ও জায়নবাদী ইসরাইল প্রতিষ্ঠার চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় পর ইন্তিফাদার ফলে প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিনি জনগণ আক্রমণাত্মক অবস্থানে এবং ইসরায়েলিরা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায় যেতে বাধ্য হয়।

এই ইন্তিফাদা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধান খুঁজতেও উদ্বুদ্ধ করেছে।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদা

২০০০ সালে ইসরায়েলি রাজনীতিবিদ ও তৎকালীন বিরোধী নেতা অবসরপ্রাপ্ত খুনি জেনারেল এরিয়েল শ্যারন মাসজিদুল আকসায় ঢুকে তাকে অপবিত্র করে। তার উদ্দেশ্য ছিল সরেজমিনে ঘুরে দেখে মাসজিদুল আকসা ধ্বংসের পরিকল্পনা প্রবর্তন করা যেখানে এই ধ্বংসাবশেষের উপরই তাদের বহুল প্রতিক্ষিত থার্ড টেম্পল নির্মাণ করা হবে। তার এই নাপাক পরিদর্শনের সময় তাকে ঘিরে ছিল প্রায় তিন হাজার ইহুদী পুলিশ। ফিলিস্তিনিরা বিশেষ করে তরুণরা তার এই অবৈধ অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তখন ইহুদী পুলিশবাহিনী গুলি চালালে সেখানেই কয়েকজন মৃত্যুবরণ করে। পরে সেই প্রতিবাদ থেকেই দানা বাঁধে দ্বিতীয় ফিলিস্তিনি বিদ্রোহের বা দ্বিতীয় ইন্তিফাদার, যা আল-আকসা ইন্তিফাদা নামেও পরিচিত।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখে শুরু হয়ে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় ইন্তিফাদা চলেছিল। দীর্ঘ এই সাড়ে চার বছরে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অন্তত ৪ হাজার ৪১২ জন নিহত হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে আরও অন্তত ৪৯ হাজার জন।

গত বছর দ্বিতীয় ইন্তিফাদার ২৩ বছরকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে কমিশন ফর প্রিজনার্স অ্যাফেয়ার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়, এই ২৩ বছরে ইসরায়েলিরা অন্তত ১ লাখ ৩৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে বন্দী করেছে। এই বন্দীদের মধ্যে ২১ হাজারই শিশু। এ ছাড়া ফিলিস্তিনের বিগত পার্লামেন্টের অর্ধেক সদস্যকেও বন্দী করেছে ইসরাইল।

গাজা উপত্যকা

ইসরাইল, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত গাজা উপত্যকা। এটি ৪১ কিমি দীর্ঘ এবং মাত্র ১০ কিমি-প্রশস্ত একটি অঞ্চল। অথচ সেই ছোট্ট অংশে প্রায় ২২ থেকে ২৩ লাখের মতো লোক বসবাস করে। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এটাই।

১৯৪৮ সালে মিশর এই অঞ্চলের পরিচালনা শুরু করে। ১৯৬৭ সালের ছয়-দিনের যুদ্ধে এর দখল নেয় ইসরাইল। ২০০৫ সালে সেখান থেকে নিজেদের সেনা ও বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করে নেয় ইসরাইল। তবে এখনো ইসরাইল গাজা এবং এর উপকূলীয় এলাকার আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করে। পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে কারা যাতায়াত করবে ও কী ধরনের পণ্য প্রবেশ করতে পারবে সেসব তদারকি করে। একইভাবে মিশরও গাজা সীমান্ত দিয়ে কারা প্রবেশ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।

পশ্চিম তীর

পশ্চিম তীর নামটি এসেছে মূলত জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের অংশ হওয়ার কারণে। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে ইসরাইল, আর পূর্বে জর্ডান। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে এই অংশটিরও দখল নেয় ইসরাইল।

১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গঠন হলেও এই অংশকে পুরোপুরি ছাড়েনি ইসরাইল। ফিলিস্তিনিরা পশ্চিম তীরকে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের অংশ মনে করে। তবে গত ৫০ বছরে ক্রমাগত এই অংশে বসতি বাড়িয়ে গেছে ইসরাইল। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পশ্চিম তীরে যেখানে এক লাখ ১০ হাজারের মতো ইহুদী ছিল, সে সংখ্যা এখন প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ। বিপরীতে ফিলিস্তিনি থাকে প্রায় ২৮ লাখ।

অবরুদ্ধ গাজা

ফিলিস্তিনের বঞ্চিত এক জনপদ গাজা। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দুর্দশার শুরু ফিলিস্তিনিদের। তবে গাজাবাসীর দুর্দশা একটু বেশিই। পান থেকে চুন খসলে তাদের ওপর নেমে আসে গুলি-বোমা- হত্যা। ইহুদী সন্ত্রাসীরা সত্যিই গাজার অধিবাসীদের মানুষ মনে করে না। সুস্থ মানুষ তো দূরের কথা, পঙ্গু, অসুস্থ, বৃদ্ধ- একচিলতে গাজায় অবরুদ্ধ সবাই। ইসরায়েলি সেনাদের বোমা হামলায় গাজার

হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অগণিত। তাদের আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি কেউ-ই, না শিশু না বৃদ্ধ। তারা আগ্রাসন চালিয়েছে শরণার্থী স্কুলগুলোতে, এমনকি বাদ যায়নি হাসপাতালগুলোও। তাদের আগ্রাসনে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে গাজার পানি ও পয়নিষ্কাশন-ব্যবস্থা। ফলে উপত্যকা জুড়ে দেখা দিয়েছে তীব্র পানি সংকট।

২০০৭ এর জুলাই গাজা উপত্যকাকে অবরোধ করে বাকি বিশ্ব থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করা হলো। গাজা পরিণত হলো এক উন্মুক্ত কারাগারে! বর্ডারে চলতো নির্বিচারে মানুষ হত্যা।

অবরোধ কার্যকর করার পর থেকে তিনবার গাজায় পূর্ণমাত্রার সামরিক হামলা চালিয়েছে ইসরাইল।

১. অপারেশন কাস্ট লিড (Operation Cast Lead)

২৭ ডিসেম্বর, ২০০৮ থেকে ১৮ জানুয়ারি, ২০০৯ সালের এই আগ্রাসনে গাজার ১,৪১৭ জন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন ৫,৩০৩ জন। ৫০,৮০০ মানুষ সম্পূর্ণভাবে হয়েছেন গৃহহীন ও বিধ্বস্ত হয়েছে ৪,০০০ টি বাড়ি। আনুমানিক ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে গাজায়। অন্যদিকে হামাসের হামলায় ইসরাইলের নিহত হয়েছে ১৩ সৈন্য ও ৩ সাধারণ নাগরিক। এই যুদ্ধ বন্ধ হয় চুক্তির মাধ্যমে।

২. অপারেশন পিলার অব ডিফেন্স (Operation Pillar of Defense)

২০১২ সালের ১৪-২১ নভেম্বরের এই আগ্রাসনে গাজায় নিহত হন ১৫৫ জন। গুরুতর আহত হন ৯৭১ জন। ২৩,২০০ মানুষ সম্পূর্ণভাবে গৃহহীন এবং ২,০৫০ টি বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। পক্ষান্তরে হামাসের হামলায় ইসরাইলের নিহত হয় ৪ সৈন্য। যুদ্ধ বন্ধ হয় 'CEASE FIRE' চুক্তির মাধ্যমে।

৩. অপারেশন প্রোটেক্টিভ এজ (Operation Protective Edge)

২০১৪ সালের ৮ জুলাই থেকে ২৬ আগস্ট গাজায় স্মরণকালের ভয়াবহ এই আগ্রাসনে ১,৯৯৪ জন মানুষ নিহত হন। এর মধ্যে রয়েছে ৪৩২ জন শিশু ও ২৪৩ জন নারী। গুরুতর আহত ৯,৮০০ জনের মধ্যে ৩,০৭৬ জন শিশু ও ১,৯০৩ জন নারী। পক্ষান্তরে হামাসের হামলায় নিহত হয়েছে ৬৪ ইসরাইলি সৈন্য ও ৩ সাধারণ নাগরিক।

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)-এর ৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায়- ৫,২০,০০০ মানুষ (গাজার মোট জনসংখ্যার ৩২ ভাগ) সম্পূর্ণ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। এদের মধ্যে ২,৭৪,০০০ মানুষ United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) পরিচালিত ৯০ টি শরণার্থী স্কুলে আশ্রয় নেন। শরণার্থী এই স্কুলগুলোতেও বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়ে ৪৮ জনকে হত্যা করেছে জায়োনিস্টরা, যাদের অধিকাংশই শিশু।

ছোট্ট এই শহরে বছরে ৩ বার এই মাপের ক্ষতি হলে সেখানে কেমন হতে পারে মানুষের জীবনযাত্রার মান ভাবা যায়! অবরুদ্ধ হয়ে আছে গাজাবাসী। ইসরাইলি আর্মির অনুমোদন নিয়ে কেবল গুটিকয়েক আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ত্রাণ ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে গাজায় ঢুকতে পারে। নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্যদ্রব্য, কাপড়-চোপড় থেকে শুরু করে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রবেশ নিষেধ এই শহরে!

গাজাবাসীর আর্তনাদ

জায়োনিস্টদের কারাগারে মানবেতর জীবনযাপন করছেন হাজার হাজার ফিলিস্তিনি। এমন অনেকেই আছেন শিশুকালে যাদের ধরে নিয়ে গেছে ইসরাইল। কারাগারেই সম্পূর্ণ জীবন পার করে দিয়েছেন তারা।

গাজাবাসীর বক্তব্য-

'গাজাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও উন্মুক্ত কারাগার বলেন অনেকে। আমরা (গাজাবাসী) বলি, তার থেকেও খারাপ। কারাগারে মানুষ নিতান্ত তিনবেলা খাবার পায়। পানি পায়। মাথার ওপরে থাকে ছাদ। সকাল-সন্ধ্যা মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে ঘুম থেকে উঠতে হয় না কারাবন্দীদের। কারাগারে মানুষদের দু'দিন পর পর চোখের জলে প্রিয়সন্তানকে কাফনের কাপড় পরিয়ে রেখে আসতে হয় না অন্ধকার কবরে। ছিন্ন-বিছিন্ন সন্তানের মৃতদেহের কিছু অংশ হাসপাতালে রেখে এসে 'হারিয়ে ফেলা হাতটি' খুঁজতেও নামতে হয় না রাস্তায়। আমাদের আগে তিন পুরুষ অমানবিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে পশুর মতো জীবন কাটিয়েছে। আমরাও একইভাবে পশুর জীবনযাপন করছি। হয়তো একই পরিণতি হবে আমাদের সন্তানেরও। কিন্তু তাদের সন্তানের জন্য একটি মুক্ত ফিলিস্তিন আমরা রেখে যাবো ইনশা আল্লাহ!' (-জাভেদ কায়সার রাহিমাহুল্লাহ)

তুফানুল আকসা

২০২৩ এর ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ সংগঠনের হামাস যোদ্ধারা এক অভূতপূর্ব প্রতিরোধ লড়াই শুরু করে। তারা জল, স্থল এবং আকাশপথে প্যারাগ্লাইডিং করে ইসরাইলে প্রবেশ করে অসংখ্য ইহুদী সেনাকে হত্যা করে এবং অসংখ্য দখলদারকে বন্দী করে নিয়ে যায়। নিজেদের জান-মাল, ঘর-বাড়ি সব কিছু বিসর্জন দিয়েও মসজিদে আকসার সম্মান উদ্ধারে কোনো প্রকার ত্রুটি করেনি তারা। তাদের এই অপারেশনে বিশ্বের ইহুদীগোষ্ঠী এবং তাদের দোসররা হতবাক হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এই অপারেশন মুসলিম বিশ্বকে আনন্দিত করেছে। হামাস এই অপারেশনের নাম দিয়েছে "অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড"। যাকে তুফানুল আকসা বলে। একে টর্নেডো অভিযান বললেও ভুল হবে না। বরং আল আকসা পুনরুদ্ধারে এটি টর্নেডো অভিযানই বটে।

এটি ২০২৩ সালের সবচেয়ে আলোচিত এবং বিশ্বের কুফরি শক্তি ও তাদের দোসরদের জন্য সবচেয়ে বড় লোমহর্ষক ঘটনা। বিগত কয়েক দশকের সবচেয়ে বড় আঘাত ছিল এটি। এমন বড় আঘাত তাদের অন্তরে পূর্বে লাগেনি। এই অভিযান ছিল তাদের বিরুদ্ধে যাদেরকে কয়েক যুগ থেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি, অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয় বলে প্রচার করা হচ্ছে। যুগের পর যুগ অত্যাচার, নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে আসছে, যাদের থাকার জন্য ঘরটাও ইহুদী বাহিনী উড়িয়ে দিয়েছে, যাদের জন্য নেই চিকিৎসা ব্যবস্থা, যারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শুধু মৃত্যুই দেখে যায়, যাদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্যই করা হয় না তাদের এমন অভিযান নিঃসন্দেহে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এই অভিযান ইহুদীদের সেই অপ্রতিরোধ্য ভাবমূর্তি একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। একই সাথে যারা নিজেদের স্বার্থ, নিরাপত্তা, ক্ষমতার লোভে ইহুদীদের দালালি আর তোষামোদ করে চলেছে তাদের দেখিয়ে দিয়েছে ইহুদী সন্ত্রাস বাহিনী অপ্রতিরোধ্য নয়।

দীর্ঘ সত্তর বছর যাবৎ ইসরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রটি যেভাবে প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনিদের উপর একতরফা নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তাদের ভিটেমাটি দখল করে নিচ্ছিলো, হামাসের জানবায মুজাহিদরা এই অভিযানে তার কিঞ্চিৎ প্রতিশোধ নিতে সক্ষম হয়েছে। মুমিনদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণে সামান্য হলেও প্রশান্তির প্রলেপ পড়েছে। বর্বর ইহুদী জাতি কিঞ্চিৎ টের পেয়েছে, স্বজনহারার বেদনা কত গভীর!

রক্তাক্ত গাজা

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসনের নির্মম চিত্র সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে চলমান এক নৃশংস অধ্যায়। বিশেষত গাজা উপত্যকায় বর্তমানে যা ঘটছে তা পুরো বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বকে তাক লাগানো তুফানুল আকসার পর ইসরাইল বাহিনী আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরাইল গাজায় ব্যাপক বিমান ও বোমা হামলা শুরু করে। ইসরাইলের সামরিক বাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল হামাসের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা, তবে এ আক্রমণে অসংখ্য বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং গাজা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

অবৈধ ইহুদী দখলদার বাহিনীর হামলায় ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি পরিণত হয়েছে এক মৃত্যুপুরীতে, যেখানে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছে, প্রাণ হারাচ্ছে অগণিত মানুষ। প্রতিটি বোমা হামলায় বিধ্বস্ত হচ্ছে ভবন, মসজিদ, হাসপাতাল এবং স্কুল। বাদ যায়নি শরণার্থী ক্যাম্পও।

তারা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোকেও ছাড় দেয়নি। খাদ্য, পানি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, এমনকি জীবনের মৌলিক উপকরণের অভাব গাজাবাসীর জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে।

সূত্রমতে, এবার ইসরায়েলি আগ্রাসন শুরুর পর শুধু প্রথম দশদিনেই শহীদানের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়েছে, যাদের এক তৃতীয়াংশ শিশু। আহত হয়েছেন বারো হাজারের উপরে।

অক্টোবর ২০২৪ এ, গাজায় আল-আকসা মার্টার্স হাসপাতালের আশ্রয়কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়, যেখানে শরণার্থীরা আশ্রয় নিয়েছিল। এই হামলায় বহু ফিলিস্তিনি নিহত হয়। তাদের মধ্যে ১৯ বছরের এক তরুণ, শাবান দালৌ, আইভি ড্রিপ দিয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থায় আগুনে পুড়ে মারা যায়। এই হামলায় অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছে।

গাজার আল-তাবাঈন স্কুলে ইসরায়েলি বিমান হামলা চালানোর পর সেখানে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ইসরাইলের তিনটি বোমা স্কুলে আঘাত হানে। আলজাজিরা লিখেছে, বোমার আঘাতে লোকজনের শরীর টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই নারী, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি।

গাজার মা'মাদানী আলআহলী হাসপাতালে (আলমুসতাশফা আলআহলী আলআরাবী আলমা'মাদানী) আগ্রাসন চালিয়ে শত শত নিরীহ নারী ও শিশুকে শহীদ করার দৃশ্যে বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। এ হামলায় শহীদ হয়েছেন অন্তত পাঁচশত জন, যাদের বেশির ভাগই শিশু ও নারী। হাসপাতালের প্রাঙ্গণে একটু আগেও খেলা করছিল ফুল-পাখীদের দল- একদিকে এ দৃশ্য আর অন্যদিকে বোমার আঘাতে জ্বলেপুড়ে ছাই হবার পর এখানে-ওখানে পড়ে থাকা কিছু দেহাবশেষ আর কিছু ছেঁড়া রঙিন জামাকাপড়!...

প্রতিনিয়ত বোমা আর গুলিবৃষ্টি সহ্য করে চলেছে গাজাবাসী। সন্তানহারা মায়ের আর্তচিৎকার গাজার আকাশকে ভারী করে তুলেছে। বাবা হারা সন্তান, স্বামী হারা বিধবা স্ত্রী, পরিবারের সকলকে হারিয়ে গাজার মানুষগুলো যেন বেঁচে থেকেও মৃত। মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় গুলি চালানো হচ্ছে, নামাজরত অবস্থায় গুলি চালানো হচ্ছে, শিশুরা ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে, নারীরা লুটিয়ে পড়ছেন, প্রতিদিন লাশ পড়ছে তবুও কেউ বলছে না সেখানে যেও না। বরং পরেরদিন তার থেকেও বেশি সংখ্যায় ফিরে এসে তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। তাদের দৃঢ়তা তাদের ঈমানে। বহু বছরের নির্যাতন সত্ত্বেও ফিলিস্তিনিরা তাদের ঈমানে অটল। এতো গুলিবর্ষণ আর বোমা হামলার মাঝেও তারা দিব্যি রব্বের হুকুম মেনে চলছে, জামাআতে নামাজ আদায় করছে। ব্যথার উপশমের জন্য তারা কুরআন তিলাওয়াত করছে হাসপাতালে শুয়ে। শরণার্থী স্কুলগুলোতে বাচ্চারা কুরআন হিফয করছে। দখলদারদের তাণ্ডবলীলা তাদের মনোবলকে দুর্বল

করতে পারেনি। তারা আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল রেখেছে। নিজেদের ভূমি ও আকসার মর্যাদা রক্ষায় তারা হাসিমুখে শাহাদাতকে বরণ করে নিচ্ছে।

বিখ্যাত ফিলিস্তিনি স্কলার ও খতীব মাহমুদ আল-হাসানাত ইতিহাসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত জুমুআহর খুতবায় বলেন,

"যদি ৩০হাজার শহীদ, ৭০হাজার আহত,
এবং ২০লক্ষ গৃহহীন ফিলিস্তিনি মুসলিম
আপনাদের জাগাতে না পারে, তবে কিভাবে আশা করবো যে আমার কয়েকটি কথায়
আপনারা জাগ্রত হবেন?

খুতবাহ শেষ।
কাতার সোজা করুন।
স্বলাতে দাঁড়িয়ে যান।"

বলেই তিনি জুমুআহর নামাজ শুরু করলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

কুফরি বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের ভূমিকা

পশ্চিমা দেশগুলোর ভূমিকা

ফিলিস্তিনিদেরকে নিজ আবাস ভূমি থেকে উৎখাত করে জুইশ (Jewish) কমিউনিটি বা ইহুদী সম্প্রদায়ের নিজস্ব আবাসভূমি ইসরাইল সৃষ্টি ও তাকে রক্ষা করার প্রতিটি পর্যায়ে পশ্চিমাশক্তি, বিশেষ করে আমেরিকা সর্বদাই সমর্থন যুগিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় পরোক্ষভাবে ইহুদীরাই বিশ্বকে শাসন করছে। একটি সম্প্রদায়ের অল্পকিছু মানুষ কীভাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা হয়ে থাকে, আমেরিকা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে, আর আমেরিকাকে নিয়ন্ত্রণ করে জুইশ লবি।

অস্ত্র, মিডিয়া, ব্যাংক, কর্পোরেট বাণিজ্য- প্রতিটি ক্ষেত্রে জুইশ কমিউনিটির পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এ কারণে বিগত এক শতাব্দী ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর যে নিপীড়ন তারা চালাচ্ছে, Clash of Civilization বা 'সভ্যতার সংঘাতে'র মোড়কে তা বৈধ করে নিয়েছে পশ্চিমা সমাজ।

আমেরিকার ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্টরা বরাবরই প্রকাশ্যে ইহুদীদের সমর্থন করে এসেছেন। যা চলতি শতকে উগ্ররূপ ধারণ করে। এই উগ্রতার শুরু বাচ্চা বুশের আমল থেকে। মার্কিন প্রশাসনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত আছে জুইশ কমিউনিটির সদস্যরা। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এডভাইজার, চিফ পলিসি ডিরেক্টর, পলিটিক্যাল এডভাইজার, মিলিটারি অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা, বাজেট ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা, ফরেন সার্ভিস ডিরেক্টর, হোয়াইট হাউজের স্পিচ রাইটারসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও পলিসি নির্ধারণের জায়গাগুলোতে আছে এদের অবস্থান। মহাশূন্যে কাজ করার প্রতিষ্ঠান নাসার এডমিনিস্ট্রেটর (ইহুদী) ডেনিয়েল গোল্ডিন ইসরাইলের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে যথেষ্ট ছাড় দিয়েছেন বলে অভিযোগ আছে।

এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকগুলো ইহুদীদের দখলে। কয়েক বছর আগে 'দি ইউনাইটেড জুইশ কমিউনিটি' ঘোষণা দিয়েছিল, ২০০৭ সালে 'ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'তে তারা ২৫ মিলিয়ন ডলারের একটি ফান্ড দেবে। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব মার্কিন ব্যাংকিং ব্যবস্থা ফেডারেল রিজার্ভের মালিকানা ইহুদী রথসচাইল্ড ৬২ পরিবারের। এই কমিউনিটি এমনই দাপুটে আমেরিকার কেউ চাইলেও এদের কিছু করতে পারবে না। অবস্থা অনেকটা এরকম হয়েছে যে, জুইশ কমিউনিটি বা ইহুদী সম্প্রদায়কে হাতে না রাখলে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। এটি ক্লিনটন প্রশাসনের সময় প্রমাণিত হয়েছে। এসব কারণে শুধু জুইশ কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যেতে হয়।

আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে মূলত কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা প্রেসিডেন্ট বানাতে পারে, চাইলে সরাতেও পারে। এসব কর্পোরেট হাউজের মালিক ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কম্পানিগুলোর মূল দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (সিইও) জুইশ কমিউনিটির সদস্য। একথা মাইক্রোসফটের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি জাপানি কম্পানি সনির আমেরিকান অফিসের জন্যও সত্য। প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে জুইশ আমেরিকানরা কাজ করছেন।

আমেরিকান মিডিয়াগুলোতে ইসরাইলের প্রভাব দেখে নেওয়া যাক।

'টাইম-ওয়ার্নার' হচ্ছে আমেরিকার অন্যতম বড়ো মিডিয়া গ্রুপের নাম। এ গ্রুপের অধীনে পত্রিকা, অনলাইন বিজনেস, মুভি প্রডাকশন হাউজ এবং টিভি চ্যানেল আছে। এর মধ্যে 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স' নামটি খুবই পরিচিত। ১০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই কম্পানির প্রতিষ্ঠাতারা ছিল ইহুদী এবং বর্তমান চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা সিইও জেরাল্ড লেভিনসহ এর গুরুত্বপূর্ণ সব পদই ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে। টাইম- ওয়ার্নারের আরেক প্রতিষ্ঠান আমেরিকান অনলাইন 'এওএল' (AOL)। এটি ৩৪ মিলিয়ন আমেরিকান সাবস্ক্রাইবার নিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। টিনএজার, নারী ও শিশুদের টার্গেট করে নামা এওএল (AOL) জুইশ কমিউনিটির প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

নব্বই দশকে ইরাক যুদ্ধ কভার করে আমেরিকায় ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠা 'সিএনএন' (CNN) টিভি চ্যানেলটির মূল ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছে টাইম-ওয়ার্নার।

আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো প্লে-টিভি চ্যানেলের নাম 'এইচবিও' (HBO)। বাংলাদেশেও এটি বেশ জনপ্রিয়। আমেরিকায় এর দর্শক ২৬ মিলিয়ন। HBO চ্যানেলটি টাইম-ওয়ার্নারের

মালিকানাধীন অর্থাৎ পুরোপুরি ইহুদী নিয়ন্ত্রিত এবং এর কথিত প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি চ্যানেল সিনেম্যাক্স (CINEMAX) টাইম- ওয়ার্নারেরই অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান। আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো মিউজিক রেকর্ড কম্পানি 'পলিগ্রাম মিউজিক'ও তাদের দখলে।

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ম্যাগাজিনের একটি 'টাইম' ম্যাগাজিন। এই পত্রিকাসহ টাইম-ওয়ার্নার গ্রুপে আছে লাইফ, স্পোর্টস ইলাসট্রেটেড, পিপল-এর মতো বিশ্বনন্দিত পত্রিকাসহ ৫০টি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন। টাইমসহ এ ম্যাগাজিনগুলোর মাথার ওপরে বসে এডিটর ইন চিফ হিসেবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে 'নরম্যান পার্লস্টেইন' নামের ইহুদী।

বিশ্বজুড়ে শিশু-কিশোরদের মনে রঙিন স্বপ্ন তৈরি করে 'ওয়াল্ট ডিজনি' নামের প্রতিষ্ঠান। এই কম্পানির ওয়াল্ট ডিজনি টেলিভিশন, টাচস্টোন টেলিভিশন, বুয়েনা ভিসতা (Buena Vista) টেলিভিশনের আছে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন নিয়মিত দর্শক। ইনডিপেনডেন্ট মুভি তৈরিতে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান মিরাম্যাক্স ফিল্মস(Miramax Films)-ও কিনে নিয়েছে ডিজনি। এই ওয়াল্ট ডিজনি কম্পানির বর্তমান সিইও মাইকেল আইসনার একজন ইহুদী।

আমেরিকার আরেকটি প্রভাবশালী মিডিয়া গ্রুপের নাম 'ভায়াকম' (Viacom)। এর প্রধান নির্বাহী সুমনার রেডস্টোনসহ অধিকাংশ পদেই আছে ইহুদীরা। জনপ্রিয় সিবিএস টেলিভিশন নেটওয়ার্কসহ ৩৯টি টেলিভিশন স্টেশন, ২০০টি সহযোগী স্টেশন, ১৮৫টি রেডিও স্টেশন, সিনেমা তৈরির বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান 'প্যারামাউন্ট পিকচার্স' তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভায়াকমের আরেক ইহুদী কো-প্রেসিডেন্ট টম ফ্রেসটনের নিয়ন্ত্রণে আছে মিউজিক চ্যানেল 'এমটিভি'। মুভি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'ইউনিভার্সাল' মিলে গিয়েছে 'এনবিসি' গ্রুপের সঙ্গে। এনবিসির মূল সংগঠন 'সিগ্রাম' (Seagram)-সহ সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদী মিডিয়ামোগল এডগার ব্রনফম্যান জুনিয়র। যার বাবা ওয়ার্ল্ড জুইশ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।

ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসনকে মার্কিনিদের কাছে বৈধ চিত্রায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে 'ফক্স নিউজ'। ফক্স নিউজের পরিচালক পিটার শেরনিনও একজন ইহুদী।

টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে 'এবিসি', স্পোর্টস চ্যানেল 'ইএসপিএন', ইতিহাসবিষয়ক 'হিস্ট্রি' চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী অধিকাংশ টিভি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইহুদীরা নিয়ন্ত্রণ করছে ।

আমেরিকায় দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৮ মিলিয়ন কপি। জাতীয় ও স্থানীয় মিলিয়ে প্রকাশিত পত্রিকা যে নিউজ সার্ভিসের সাহায্য নেয় সেটি 'দি এসোসিয়েটেড প্রেস' বা

এপি (AP)। এ প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজিং এডিটর ও ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল সিলভারম্যান একজন ইহুদী। প্রতিদিনের খবরে কী যাবে আর কী যাবে না, তা এই সিলভারম্যানই ঠিক করে দেয়।

আমেরিকার পত্রিকাগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী তিনটি পত্রিকা হলো- 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' এবং 'ওয়াশিংটন পোস্ট'। এ তিনটি পত্রিকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইহুদীদের হাতে।

ওয়াটারগেট কেলেংকারির ৬৫ জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগে বাধ্য করে 'ওয়াশিংটন পোস্ট'। পত্রিকাটির বর্তমান সিইও ডোনাল্ড গ্রাহাম ইহুদী মালিকানার তৃতীয় প্রজন্ম। উগ্রবাদী ইহুদী হিসেবেও তিনি পরিচিত। ওয়াশিংটন পোস্টগ্রুপ আরো কিছু পত্রিকা প্রকাশ করে। এর মধ্যে শুধু আর্মিদের জন্য রয়েছে ১১টি পত্রিকা। এই গ্রুপের আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত। পত্রিকাটির ইন্টারন্যাশনাল এডিশনের সম্পাদক মুসলমান নাম ফরিদ জাকারিয়া দেখে বা কিছু ক্ষেত্রে এর উদারতার জন্য অনেকে একে 'লিবারেল' পত্রিকা মনে করেন। টাইম সাময়িকীর পরে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রভাবশালী এই সপ্তাহিকটির নাম 'নিউজ উইক'।

আমেরিকার রাজনৈতিক জগতে প্রভাবশালী পত্রিকা নিউইয়র্ক টাইমসের মালিকানা কয়েক প্রজন্ম থেকে ইহুদীদের হাতে। বর্তমান প্রকাশক ও চেয়ারম্যান আর্থার শুলজবার্জার, প্রেসিডেন্ট ও সিইও রাসেল টি লুইস এবং ভাইস চেয়ারম্যান মাইকেল গোল্ডেন সবাই ইহুদী। বিশ্বের অর্থনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তাদের নিয়ন্ত্রণ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। আঠারো লাখেরও বেশি সার্কুলেশনের এই পত্রিকার ইহুদী প্রকাশক ও চেয়ারম্যান পিটার আর কান তেত্রিশটিরও বেশি পত্রিকা ও প্রকাশনা সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন।

আমেরিকার মুভি ইন্ডাস্ট্রি হলিউডের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, মুভি নির্মাতা, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে রয়েছে ইহুদীদের প্রাধান্য। এই তালিকা যথেষ্ট লম্বা। সহজে শেষ হবে না।

বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া আমেরিকার নেতৃত্বে রয়েছে ইহুদীবাহিনী। তারা আমেরিকাকে তাদের হাতের মুঠোয় পুরে রেখেছে বলা যায়। ইসরাইলের আগ্রাসনে আমেরিকার সরাসরি সমর্থন তো রয়েছেই এছাড়াও তারা সামরিক, অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রে পুরোপুরি ইসরাইলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

জাতিসংঘ

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন লক্ষ্য ছিল বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, এবং মানবাধিকার রক্ষা করা। ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘ বারবার প্রস্তাব পাস করেছে, যা আজও কার্যকর হয়নি। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত করার প্রস্তাব করেছিল। এর মাধ্যমে একটি ইহুদী রাষ্ট্র ও একটি আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু সে পরিকল্পনা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি।

ইসরাইল-ফিলিস্তিন 'সংঘর্ষ' নিরসনে ১৯৬৭ সালের ২২ নভেম্বর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ২৪২ নম্বর প্রস্তাবনা পাস হয়। এই প্রস্তাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিক- দুই পক্ষের মধ্যে ভূমি বিনিময়। প্রস্তাবনায় যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী কর্তৃক দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া, ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলোর প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘ সনদের পঞ্চম চ্যাপ্টার অনুযায়ী প্রণীত হয় ২৪২নং প্রস্তাব। কিন্তু এসব কাগুজে উদ্যোগ কখনোই মেনে নেয়নি ইসরাইল।

১৯৭৩ সালের অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২৪২নং প্রস্তাবনার আলোকে ৩৩৮নং প্রস্তাব পাস করে, যার উদ্দেশ্য ২৪২নং প্রস্তাবনার বাস্তবায়ন। কিন্তু এ প্রস্তাবনাও ইসরাইল গ্রাহ্যই করেনি।

জাতিসংঘের কার্যকলাপ, বিশেষত ইসরাইলের দখলদার নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান দেখা যায়নি। গাজায় বোমা হামলা, শিশু হত্যাকাণ্ড, হাসপাতাল ধ্বংস এবং অবরোধের মতো অপরাধগুলোর জন্য জাতিসংঘ কঠোর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। গাজা স্ট্রিপে ইসরাইলের ২০০৭ সাল থেকে আরোপিত অবরোধের ফলে মানবিক সংকট চরমে পৌঁছালেও জাতিসংঘের তেমন কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ে না। খাদ্য, চিকিৎসা এবং পানির সংকটে ভুগছে গাজার মানুষ। অথচ জাতিসংঘ এ নিয়ে শুধু তহবিল আহ্বান করেছে, কোনো প্রকার চাপ প্রয়োগ করেনি। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের দখলদারিত্বের নিন্দা জানানো হলেও তা প্রতিরোধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পূর্ব জেরুজালেম এবং পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপন অব্যাহত থাকলেও জাতিসংঘ এই বিষয়ে কেবল চিন্তা প্রকাশ করা ছাড়া কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি, বাধ্যতামূলক কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। শরণার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সমাধানে কোনো স্থায়ী পরিকল্পনা জাতিসংঘ থেকে আসেনি। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতে জাতিসংঘ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও ফিলিস্তিনে ইসরাইলের আগ্রাসনের বিষয়ে তেমন উদ্যোগ দেখা যায়নি। মুসলিম বিশ্ব

বারবার জাতিসংঘের প্রতি ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেও তাদের এই আহ্বান কার্যত উপেক্ষিত হয়েছে।

ফিলিস্তিন ইস্যুতে জাতিসংঘের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুই একটি নীতিগত অবস্থান, যা কখনোই কার্যকর রূপ লাভ করেনি। নিরাপত্তা পরিষদের বেশ কয়েকটি প্রস্তাব থাকলেও সেগুলো বড় শক্তিগুলোর স্বার্থের কারণে কখনোই সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। ইসরাইলকে দখলদারিত্ব থেকে সরে আসতে বলা হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশ প্রায়শই ইসরাইলের পক্ষে ভেটো প্রদান করে প্রস্তাবগুলো অকার্যকর করে দেয়। এর ফলে ফিলিস্তিন সংকট ক্রমাগত আরও জটিল হয়ে উঠছে।

জাতিসংঘ মূলত পশ্চিমাদেরই হাতের পুতুল। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইসলামের প্রতি, মুসলিমদের প্রতি কখনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি, বরং ইসলাম বিদ্বেষে ভরপুর এই সংগঠন বিশ্ব মানবতার বুলি আউড়িয়ে স্বজাতির পক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমানে ইসরায়েলের সমর্থনে রয়েছে পশ্চিমা দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছে। তারা ইসরাইলে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর পাশাপাশি তাদের আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে জার্মানি, গ্রিস, ইতালি, স্পেন, চেক প্রজাতন্ত্র, ইউক্রেন এবং পোল্যান্ড ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কানাডা এবং যুক্তরাজ্য এসব দেশও ইসরাইলের প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করেছে। অন্যান্য কিছু দেশ নিরপেক্ষ থাকার কথা বললেও তাদের কার্যক্রম ইসরাইলকে সমর্থন করার ইঙ্গিত দেয়। কুফরি বিশ্ব একজোট হয়ে ঠিকই ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

ওআইসি

মুসলমানদের প্রথম কিবলা আল-আকসায় ইসরাইলের অগ্নিসংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় জোট "অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন" সংক্ষেপে ওআইসি। অগ্নিকাণ্ডের পর জেরুজালেমের প্রধান মুফতির ভবিষ্যতে 'ইহুদিবাদী অপরাধ' রোধের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রনেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সৌদি আরবের তৎকালীন বাদশাহ উদ্যোগী হলে ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ওআইসি। ইসলামের প্রথম কিবলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্মৃতিবাহী আল-আকসা মসজিদ এবং ফিলিস্তিন ইস্যু মুসলিম উম্মাহকে দারুণভাবে হতাশ ও মর্মাহত করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে ওআইসি'র প্রতিষ্ঠা মুসলিম দেশের জনগণকে আশাবাদী করে তুলেছিল। খিলাফতব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্বশূন্যতা ওআইসি কিছুটা হলেও পূরণ করতে পারবে এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনমনে। ওআইসিও আশাব্যঞ্জক কিছু কর্মসূচি নিয়েছিল। তবে আশানুরূপ কোনো ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। ওআইসি যে লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল তা থেকে সংস্থাটি তথা সৌদি আরবসহ প্রভাবশালী মুসলিম দেশগুলো আজ অনেক দূরে চলে গেছে। সৌদি আরবসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আরব দেশগুলো ইসরাইলের সাথে সখ্যতা বাড়িয়েছে। তারা ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিতে চলেছে। ফলশ্রুতিতে ওআইসি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়েছে। ফিলিস্তিনিদের জন্য ওআইসি কার্যকর কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি।

মুসলিম বিশ্বের নিষ্ক্রিয়তা

কুফরি বিশ্ব "আল কুফরু মিল্লাতু ওয়াহিদা" অনুসরণ করলেও মুসলিম দেশগুলো "মুমিন পরস্পর ভাই ভাই" অনুসরণে ব্যর্থ। তারা নিজেদের স্বার্থে, রাজনীতি, অর্থনীতি, ক্ষমতার জন্য ফিলিস্তিনকেই ভুলে গেছে। ভুলে গেছে মুসলিম উম্মাহর প্রাণের স্পন্দন আল আকসাকে। ভুলে গেছে উম্মাহর মুজাহিদদের সংগ্রাম। সৌদি আরব ইরানের প্রভাব মোকাবিলা করতে ইসরাইলের সঙ্গে কৌশলগত মৈত্রী গড়ার দিকে মনোযোগী। ফিলিস্তিন ইস্যুতে তারা যথেষ্ট নিষ্ক্রিয়, নেই কোনো পদক্ষেপ। অন্যদিকে মিশর ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম আরব দেশ। তারা ফিলিস্তিনের গাজার সীমান্তে রাফাহ ক্রসিং পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে ফিলিস্তিনের পক্ষে তাদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেও দেখা যায়নি। কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনের পক্ষে থাকলেও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে না পারায় ফলাফল ফিলিস্তিনের দুর্দশা দূর হচ্ছে না। গাজাবাসীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু মুসলিম বিশ্ব চুপ। তারা শুধু মৌখিক বিবৃতি দিয়েই খালাস। অথচ সব মুসলিম দেশ এক হলে ইহুদী বাহিনী এবং তার দোসরদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফিলিস্তিন সংকটে বিশ্বের মুসলমানদের ভূমিকা ও উম্মাহর করণীয়

বর্তমানে বিশ্বে মোট মুসলিম জনসংখ্যা ২০০ কোটির বেশি। প্রত্যেকের দায়িত্ব ইসলামের তৃতীয় পবিত্র স্থান জেরুজালেম ও মসজিদুল আকসাকে রক্ষা করা। ফিলিস্তিনিরা গত কয়েক দশক ধরে মুসলিমদের সেই করণীয় পালন করে আসছে। এটি দায়িত্ব হিসেবে তাদের জন্য ফরজে কিফায়া। তারা সেখানে না থাকলে তা রক্ষা করা আমাদের সবার কর্তব্য ছিল। তাই ফিলিস্তিনিরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যা করছেন তা হলো মুসলিম উম্মাহর পক্ষে একটি ফরজ দায়িত্ব পালন।
ফিলিস্তিনি সেসব ভাইদের জন্য মুসলিম এবং আল আকসা রক্ষায় উম্মাহর যেসব করণীয় রয়েছে তা তুলে ধরা হলো।

১. উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ হওয়া

কুরআনে কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (সুরা হুজুরাত, আয়াত:১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানরা একটি দালানের মতো। একটি ইট আরেকটি ইট দিয়ে দেয়ালকে মজবুত করে। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে মিলে উম্মতকে মজবুত করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, সমগ্র উম্মত একটি দেহের মতো।

তাই সকল মুসলিম দেশকে একত্রিত করা উচিত। যেমনটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মহিমান্বিত কুরআনে বলেছেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

“আল্লাহর রজ্জুকে সবাই সম্মিলিতভাবে দৃঢ় ও শক্তভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।” (সূরা আল ইমরান, আয়াত:১০৩)

وَلاَ تَفَرَّقُوا অর্থাৎ "পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না" এর মাধ্যমে দলে দলে বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই মহিমান্বিত কুরআন ও হাদীস আমাদেরকে বলছে যে বিভক্ত হবে না। মুসলমানগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে আজ দ্বিধা বিভক্ত। ফলশ্রুতিতে ফিলিস্তিনসহ সারা বিশ্বে মুসলমানগণ মার খাচ্ছে। তাই আমাদের মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। ফিলিস্তিন ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসলিম রাষ্ট্র গুলোকে নিজেদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য স্থাপন করতে হবে। আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে এটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে বিশ্বের সকল মুসলিমকে একত্রিত করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে একটি দেহের ন্যায় তুলনা করেছেন।

হজরত নুমান ইবনে বশির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

‘মুমিনদের পরস্পরের ভালোবাসা, অনুগ্রহ, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার উদাহরণ হচ্ছে একটি দেহ বা শরীরের মতো। যখন দেহের কোনো একটি অঙ্গ আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তখন সারা দেহের সবগুলো অঙ্গই নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে এবং কষ্ট-যন্ত্রণায় জরাগ্রস্ত ও কাতর হয়ে পড়ে।’ (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

দেহের এক অঙ্গে আঘাত পেলে যেমনিভাবে পুরো দেহ আঘাত প্রাপ্ত হয় তেমনিভাবে মুসলমানদের যেকোনো সংকটেই পুরো উম্মাহকে জেগে উঠতে হবে। তাই কেউ যে চিন্তাধারারই হোক না কেন, যে মাজহাবেরই হোক না কেন, যে দেশেরই হোক না কেন, ফিলিস্তিনিদের জন্য এবং মাসজিদুল আকসার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত।

২. দৃঢ় প্রত্যয়ী হওয়া

মুসলমানদের অন্তর আজ মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছে। ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। মুসলমানরা কখনো শক্তি সামর্থ্যের কাছে পরাজয় বরণ করেনি বরং পরাজয় বরণ করেছে নিজেদের দূর্বলতার কাছে। তাই ফিলিস্তিন বিজয়ের জন্য মুসলমানদেরকে সকল দূর্বলতা কাটিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাকতে হবে।

৩. মুসলিম উম্মাহকে প্রস্তুত ও প্রশিক্ষিত করা।

এই যুগে মুসলিমদেরকে সাহসী ও দৃঢ় হতে হবে। মুসলিমদেরকে এই যুগের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। মুসলিম উম্মাহ এবং মানবতা একটি চূড়ান্ত যুগে প্রবেশ করেছে। কিয়ামতের পূর্বে একটি কঠিন সংঘর্ষ হবে। মুসলিমদের ওপর একটি কঠিন শাস্তি নেমে আসবে। পৃথিবী জুড়েই জুলুম অত্যাচার দেখা যাবে। চলমান সময়ের সেসবের আবেশ দেখা যাচ্ছে। সেই যুগের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে। সামনে এখনো কিছু সময় বাকি আছে। সি সময়ের জন্য মুসলিম উম্মাহকে প্রস্তুতি নিতে হবে। তাদেরকে সেই সময়ের ব্যাপারে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই ব্যাপারে যদি উম্মতের তারবিয়াত না করা হয় অথবা তাদেরকে প্রস্তুত না করা হয়, তাহলে আল্লাহর দরবারে পাকড়াও হতে হবে।

৪. নারীদের কুরবানি ও আত্মত্যাগ প্রকাশ্যে আনা।

পুরুষদের কুরবানি ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে বেশ আলোচনা করা হয়। তাই তা সাধারণত সবার সামনে প্রকাশিত থাকে। কিন্তু নারীদের কুরবানি ও আত্মত্যাগ আড়ালেই থেকে যায়! দুনিয়াবাসীর কাছে গোপন থাকে। তাই তাদের সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। তাদের শরীরের মতো এই কুরবানি ও আত্মত্যাগ সম্পর্কেও কেউ জানে না যে, অমুক দাওয়াতি মেহনত, অথবা অমুক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে এবং তার বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া ফয়েজ ও কল্যাণের পেছনে শুধু একজন পুরুষের হাত নেই, বরং একজন বিশ্বস্ত, উদ্যমী ও অনুগতা নারীর ভূমিকাও রয়েছে।

৫. মাসজিদুল আকসার সাথে জুড়ে থাকতে হবে।

উম্মাহর প্রথম কিবলা মাসজিদুল আকসা। মাসজিদুল আকসা কোনো সাধারণ জায়গা নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদুল আকসা সম্পর্কে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ মাসজিদুল আকসায় গিয়ে তার খিদমাত করতে না পারে, তাহলে সে অন্তত সেখানকার বাতিগুলো জ্বালানোর জন্য তেল পাঠাতে পারলে তা-ই যেন অবশ্যই পাঠায়। কোনো এক শায়েখ বলেন এর দ্বারা বোঝায় যে, পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো না কেন, মাসজিদুল আকসার সাথে যুক্ত থাকতে হবে, অবশ্যই আকসার সাথে জুড়ে থাকতে হবে।

৬. আল-আকসা মসজিদের ফজিলত জানা ও বর্ণনা করা।

আকসা মুসলিম উম্মাহর হৃদস্পন্দন। মুসলিম উম্মাহকে জানতে হবে আল-আকসার গুরুত্ব, ফজিলত। যখন আকসার মর্যাদা বুঝে আসবে তখনই একে রক্ষার গরজ তৈরি হবে। আল-আকসা মসজিদ একটি মর্যাদাপূর্ণ জায়গা। ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه

“এর চারপাশ বরকতময়।”

এটা আশ্চর্যজনক যে, বাইতুল মুকাদ্দাস এমন একটি জায়গা, যেটির চারপাশের বরকত উল্লেখ না করে কুরআনের কোথাও তাকে উল্লেখ করা হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে,

يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِين

“হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।”

৭. গুরুত্ব সহকারে দু'আ করা

দুআ অত্যন্ত কার্যকরী একটি অস্ত্র। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস অনুসারে দু'আ হলো মুমিনের অস্ত্র। নবীজী বলেন-

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

দুআ হচ্ছে মুমিনের হাতিয়ার। -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস **১৮১২**
আর এটা এমনই হাতিয়ার, কুরআনের ভাষ্য মতে যা ব্যবহার করে-

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ

এমন কত ছোট দলই না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের ওপর জয়যুক্ত হয়েছে! (সূরা বাকারা, আয়াত:২৪৯)

দুআর মাধ্যমে ছোট ছোট দল বিশাল বিশাল বাহিনীকে পরাস্ত করে ফেলে। ইতিহাসে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দরবারে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য এবং জালেমদের জুলুম বন্ধ করার জন্য দু'আ করা। কুরআনুল কারিমের নির্দেশনা অনুসারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় অবস্থানকালে মক্কার নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য দু'আ করেছিলেন। অপরদিকে ৮ হিজরিতে মক্কা বিজয়ের জন্য উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এরকম সময় ও পরিস্থিতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুনুতে নাজিলা পড়ারও নির্দেশ দিতেন।

এজন্য আমাদের উচিত ফিলিস্তিনের মানুষ এবং মাসজিদুল আকসার জন্য দু'আ করা। তাদের নিরাপত্তার জন্য, বিজয়ের জন্য দু'আ করা উচিত। আল্লাহ যেন তাদের শান্তি ও সক্ষমতা দান করেন, আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন ফিলিস্তিনিদের যারা শহিদ হয়েছেন, আল্লাহ যেন তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন।

৮. বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া

কুরআন বলছে,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা করো নামাজের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব।

নামাজ তো ফরজ। তবুও এই উম্মাহ নামাজের জন্য উঠতে প্রস্তুত নয়। তবে তাদের কাছে উম্মাহ কী ফায়দা পেতে পারে! ফরজ নামাজের সাথে নফল নামাজ পড়তে হবে। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াজিফা।
মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো,

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

“ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও।”

আমাদের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাহায্য পাওয়ার জন্য বেশি বেশি সিজদাহ করা। সিজদাহগুলোকে দীর্ঘ করা। নামাজের মাধ্যমেই সাহায্য প্রার্থনা করা। ফরজ নামাজের পাশাপাশি নফল নামাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া। বেশি বেশি সিজদাহ করা।

৯. সকল প্রকার পাপ কাজ পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া

আল্লাহর অবাধ্য, বিদ্রোহী ও নাফরমানদের জন্য কখনোই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সাহায্য আসে না। সূরা নাহলের শেষ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।”(সুরা নাহল, আয়াত:১২৮)

অর্থাৎ তাদের জীবন থেকে পাপ, মিথ্যাচার ও অবাধ্যতার আচরণকে দূর করে। যদি কেউ তার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন।

সুরা বাকারা থেকেও এই দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দু'আ কবুল হওয়ার এই শর্ত বলেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাঁর সমস্ত আদেশ নিষেধের সম্পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون َ

"আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।"(সুরা বাকারা, আয়াত:১৮৬)

১০. ইতিহাস অধ্যয়ন

আমাদের উচিত, এই সময়ে ইহুদী ও ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনের বিস্তারিত ইতিহাস অধ্যয়ন করা। যুগ যুগ ধরে আমাদের গৌরব, আমাদের আকসাকে রক্ষার ইতিহাস জানা। নিজের কাছের লোকদেরকেও এ সকল ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বই-রিসোর্স সরবরাহ করা।

১১. শিশুদের মধ্যে জিহাদ ও শহিদ হওয়ার আগ্রহ তৈরি করা

এই সময় হচ্ছে আমাদের জন্য নিজের সন্তানদের জেহেন- মনন প্রস্তুত ও তৈরি করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ। শিশুদের ফিলিস্তিনের ইতিহাস শোনাতে হবে, জানাতে হবে ইহুদীদের ইতিহাস। তাদের অন্তরে উম্মাহর প্রতি দরদ-বেদনা, জিহাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা তৈরি করতে হবে। এতে তাদের মধ্যেও উম্মাহর প্রতি দায়িত্ববোধ জন্মাবে এবং ইসলামের খিদমতের জন্য মুজাহিদসুলভ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর জোগান পাওয়া যাবে। আজ ইসরাইলের সন্তানরা সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রজন্মকে মূর্তিপূজা, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও মাদকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রজন্মের শিশুদের বিশুদ্ধ ঈমান ও আকিদা- বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। বিশুদ্ধ ঈমানের বীজ বপন করতে পারলে তা থেকে অঙ্কুরিত হবে মুসলিম উম্মাহর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ।

১২. আর্থিক সহায়তা

বর্তমানে ফিলিস্তিনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা। ভয়ংকর অর্থনৈতিক অবরোধ, কর্মহারা, ক্রসিং বন্ধ হওয়া, কৃষি জমি উজাড়, ঘরবাড়ি ধ্বংস, খাদ্য-বস্ত্র-অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি, যুবকদের শাহাদাত বরণ, অসংখ্য নারী বিধবা হওয়ার ফলে তারা আজ দিশেহারা। সকল মুসলমান চাইলেই স্ব শরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলেও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে জিহাদে অংশগ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে। আমাদেরকে আর্থিক সহায়তার নজির স্থাপনের মধ্য দিয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী কোনো যোদ্ধাকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে দিল, সেও যেন জিহাদ করলো (বুখারী-২৮৪৩)। ফিলিস্তিনের জন্য আজ এক টাকা দান আল্লাহর কাছে সাতশ টাকা দানের চেয়েও অধিক সমতূল্য হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, হজ্জ ও জিহাদের ক্ষেত্রে এক দিরহামকে সাতশ গুণ বাড়িয়ে প্রতিদান দেয়া হবে।

আমাদের দায়িত্ব হলো এই সময় আমাদের খরচ কমিয়ে দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করে যার যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশ্বাস থাকে, তার মাধ্যমে যতটা সম্ভব ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য আর্থিক সহায়তা পাঠানো। যত বেশি আর্থিক সহায়তা করা যাবে তত বেশি ভালো। ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের চিকিৎসা, শিক্ষা ও খাবারের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ করতে চেষ্টা করা। যার যতটুকু সামর্থ্য সেই অনুযায়ী সহায়তা পাঠানো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পরিমাণ দেখেন না। তিনি যা দিয়েছেন তা থেকে কত অংশ দান করা হচ্ছে তা দেখেন। তাই আমদের উচিত এই সময়ে আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ করা।

১৩. 'নাহি আনিল মুনকার বিল লিসান' (মুখ দ্বারা অসৎকাজে বাধা দেওয়া)-এর ফরজ আদায়

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলিদের নৃশংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা। ইউটিউব, প্রেসক্লাব অথবা যেখানেই সুযোগ পাওয়া যায়, সেখানেই বক্তৃতা ও লেখালেখি, সাহিত্যের মাধ্যমে, পুস্তিকা বা ই-বুকের মাধ্যমে বিশ্বকে সচেতন করা। আরও প্রচারের মাধ্যম হতে পারে বিলবোর্ড বা পোষ্টার। তা হতে পারে বিল্ডিং, বাড়ি বা হোল্ডিং অথবা বাস। এভাবে নিজের শহরে, নিজের দেশে, ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ফিলিস্তিনি ভাই-বোনের ওপর সংঘটিত নৃশংসতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে। এছাড়াও মূলধারার মিডিয়াতে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলিদের নৃশংসতার কথা

জোরালোভাবে প্রচার করার ব্যবস্থা করা। যার যেমন সক্ষমতা আছে, তা দিয়েই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও নির্যাতিতদের সাহায্যের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত।

১৪. শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা

ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে পুরো বিশ্বে সামাজিক স্তরে নিজ নিজ দেশের আইন মেনে বৃহৎ পরিসরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে। এর ফলে পুরো বিশ্ব জানতে পারবে যে, মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং একে অপরের দুঃখ অনুভব করছে। এটি ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরও আনন্দিত করবে এবং এটি তাদের সাহস বাড়ানোর কারণ হবে।

১৫. মুসলিম শাসক, ক্ষমতাসীন শ্রেণি ও উম্মাহর সেনাবাহিনীর কাছে দাবি জানানো

জনসাধারণের মাঝে এই প্রতিক্রিয়া থাকা উচিত তারা নিজেদের জযবা, ক্ষোভ ও আবেগ নিজেদের সরকার পর্যন্ত পৌঁছাবেন। যখন মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবং বিশ্ব মুসলিম নেতৃবর্গ বাহ্যত নিজেদের দায়িত্বটুকু আদায় করছে না, এমন সময়ে সাধারণ মানুষদের করণীয় হচ্ছে নিজের অবস্থান থেকে প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা। সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো।
সাধারণ মানুষ তো সেখানে গিয়ে জিহাদে শরীক হতে পারছে না এবং এটা তাদের সক্ষমতারও বাইরে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ যেতে চাইলেও সমস্যা তৈরি হওয়া ছাড়া কোনো কাজের কাজ হবে না। কিন্তু নিজেদের সরকারের প্রতি জোর দাবি জানানো এবং তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে হবে। যাতে সরকার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এজন্য সর্বস্তর থেকে এ মুহূর্তে প্রতিবাদের আওয়াজ উচ্চকিত হওয়া জরুরী।

১৬. সামরিক প্রশিক্ষণ

সামরিক প্রশিক্ষণ একটি দেশের নিরাপত্তায় ব্যাপক ভূমিকা রাখে। শত্রুর কবল থেকে দেশকে নিরাপদ রাখতে সামরিক প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। ইসরাইল তার প্রতিটি নাগরিককে সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়। তাই মুসলমানদেরও উচিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে এমন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। আর এটি মুসলিম দেশগুলোর সরকারের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত।

১৭. কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক প্রতিবাদ করা। তাদের দূতাবাস বা কনস্যুলেট থাকলে সেখানে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরাইলি সরকারের নৃশংসতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদূতকে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদ জানানো যায়।

যে আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের দেশে ইসরায়েলি দূতাবাস খুলে দিয়েছে, তাদের উচিত অবিলম্বে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে ফেরত পাঠানো, তাদের দূতাবাস বন্ধ করা ও তাদের রাষ্ট্রদূতকে ইসরাইল থেকে অবিলম্বে ফেরত আনা। যখন মুসলিম দেশগুলো ইসরাইলের সাথে এই ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তখনই তার ওপর কিছু চাপ পড়বে।

১৮. ইসরাইলি পণ্য বয়কট করা

বর্তমান সময়ে আমরা বয়কটের প্রভাব বেশ ভালোভাবেই লক্ষ্য করছি। বয়কট একটি দেশের অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে তা সম্পর্কে মোটামুটি অনেকেই অবগত। বয়কটের কার্যকারিতা সম্পর্কে লোকজনকে অবগত করতে হবে। বিশ্বের মুসলিমদের জন্য সকল ইসরায়েলি পণ্য বয়কট করা উচিত। যেখানেই তাদের পণ্য ব্যবহার করা হচ্ছে, সেখানে মুসলিম বিশ্বের মানুষদের তাদের সম্পূর্ণ বয়কট করতে হবে যাতে ইসরাইলকে গুরুতর অর্থনৈতিক ধাক্কার সম্মুখীন হতে হয়। একই সাথে বাণিজ্য বয়কট করা। মুসলিম দেশগুলোকে ইসরাইলের সাথে সব ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। আজ বিশ্বে ৫৭টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রয়েছে। যদি মুসলিমরা একত্রিত হয়ে ইসরাইলের সাথে বাণিজ্য বয়কট করা হয়, যদি

কোনোভাবেই তাদের কোনো পণ্যের লেনদেন না করা হয় তাহলে এটি অনেক ফায়দাজনক একটি কাজ হবে।

ফিলিস্তিন ইস্যুকে দাঁড় করিয়ে মুসলিম উম্মাহর ইহুদী সম্প্রদায় এবং তাদেরকে সাহায্যকারী পশ্চিমাদেরকে বয়কট করতে হবে। বয়কটের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক অনেক প্রভাব রয়েছে। পশ্চিমাদের উৎপাদিত পণ্যের সবচেয়ে বড় ভোক্তা হলো মুসলিম সম্প্রদায়। মুসলমানগণ সম্মিলিত ভাবে কাফেরদেরকে বয়কট করতে পারলে তাদের টনক নড়বে। বিশ্ব ভূখন্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় ৭০ শতাংশ মুসলমানদের দখলে। তাই কাফেরদের বয়কট করার মধ্য দিয়ে মুসলিম উম্মাহ নিজেদের সম্পদের যথার্থ ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে।

১৯. আল্লাহর দ্বীনের বিজয় ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো ইসলামের প্রতি আনুগত্য না করা এবং ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা ও বিজয়ী করার সংগ্রামকে অবহেলা করা। বিশ্বে ৫৭টি মুসলিম দেশ এবং দুই বিলিয়নের বেশি মুসলমান থাকা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব পালন না করার কারণে আজকের উম্মাহ লাঞ্ছনা ও অপমানে ভুগছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের অর্থ অনুসারে, ভবিষ্যতে ইমাম মাহদিকে সাহায্য করতে পূর্ব দিক থেকে বাহিনী বের হবে। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দ্বীনকে জয় করার সংগ্রামে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করা।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَأْيَاتُ سُوْدٌ فَلَا يُرَدُّها شَيْئٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيْلِيَاءَ

খোরাসান থেকে (মাহদি আ.-এর সমর্থনে) কৃষ্ণবর্ণের পতাকাবাহী সৈন্যদল বের হবে। অবশেষে তা বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থাপন করা হবে। কোনোকিছুই তা প্রতিহত করতে পারবে না।(সুনানে তিরমিজি, অধ্যায়:ফিতনা, হাদীস:২২৭২)

আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাদের সমস্ত দক্ষতা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে পূরণ করার ক্ষমতা দান করেন।

২০. সম্মিলিত জিহাদ ঘোষণা

ইহুদী সম্প্রদায়কে আজ পুরো কাফের বাহিনী সহায়তা করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ নিজেদেরকে মানবাধিকার রক্ষা কবচ বলে ঘোষণা দিলেও তারা শুধুমাত্র খ্রিষ্টান ও স্বজাতির পক্ষেই কাজ করছে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী। আজ ইহুদী সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া মানে পুরো কাফের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। তাই মুসলিম উম্মাহকে আজ সম্মিলিত ভাবে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। আমরা অনেকে মনে করি, ফিলিস্তিনে জিহাদের দরজা খুলে গেলেই সবাই জিহাদে ঝাপিয়ে পড়বে এবং বিজয় ছিনিয়ে আনবে। বাস্তবে বিষয়টা মোটেই সহজ নয়, তাই প্রথমে মুসলিম উম্মাহকে বৃহত্তর ঐক্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে সম্মিলিত জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। আল কুদসের একমাত্র মুক্তির পথ হচ্ছে জিহাদ।

কুরআন গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্বোধন করে বলছে-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

“আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছো না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।”(সুরা নিসা, আয়াত:৭৫)

আজ এই আয়াতটি গাজার মুসলমানদের চিত্রায়ণ করছে। আজ তারা নির্যাতিত নিষ্পেষিত। তারা দু’আ করছে, আয় আল্লাহ, আমাদের এই মুসিবত থেকে উদ্ধার করুন। কুরআন বলে যে, হে মুসলিমরা! তোমরা তাদের পক্ষে কেন জিহাদে অবতীর্ণ হচ্ছো না! এটা হলো কুরআনের বার্তা।

এজন্য প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির উচিত জিহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া এবং সাধারণ মানুষকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে সম্মিলিতভাবে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া।

২১. আল আকসার মুক্তি যে পথে

সত্যবাদী উলামায়ে কিরামের উচিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে ভয় করা এবং স্বীয় জান নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয়ে পড়া। কারণ জিহাদের ময়দানগুলো তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়াোজনবোধ করে। ব্যবসায়ী ও চাকুরী জীবীদের উচিত তাদের যাকাত দিয়ে তাকে সহযোগীতা করা। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের উচিত তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে শামের জিহাদকে সাহায্য করা। যাতে সকল প্রচেষ্টাগুলোকে একটি অবয়বে দাঁড় করানো যায়, যার দ্বারা আল্লাহর হুকুমে আল-কুদসকে মুক্তকারী বাহিনী গড়ে তোলা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

"তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব ছাউনী প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের বর্তমান শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত্র করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব লোককেও, যাদেরকে তোমরা এখনও জান না। কিন্তু আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে কিছু কম দেওয়া হবে না"। (সূরা আনফাল, আয়াত:৬০)

এটাই মসজিদে আকসাকে মুক্ত করার পথ। জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমে। যা আল্লাহ তার মহান কিতাবে বিধিবদ্ধ করেছেন।

ইরশাদ করেছেন,

فَقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ عَسَي اللهُ اَنْ يَّكُفَّ بَاْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَاللهُ اَشَدُّ بَاْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا

"সুতরাং তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। তোমার উপর নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার নেই। অবশ্য মুমিনদেরকে উৎসাহ দিতে থাক। অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ কাফেরদের যুদ্ধক্ষমতা চূর্ণ করে দেবেন। আল্লাহর শক্তি সর্বাপেক্ষা প্রচন্ড এবং তার শাস্তি সবচেয়ে কঠোর"। (সূরা নিসা, আয়াত:৮৪)

উপসংহার

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বরকতময় ভূমি ফিলিস্তিন। এ ভূমি ধন্য হয়েছে এখানে জীবন-যাপনকারী অসংখ্য সাহাবীর সোনালী পরশে; বরকতময় হয়েছে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর বদৌলতে; মহিমান্বিত হয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ আর প্রলয়ঙ্কর লড়াইয়ের কারণে, যেগুলো সংঘটিত হয়েছিল ফিলিস্তিনের এই পবিত্র ভূমিতে।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত বরকত নিশ্চিত করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

“আমার উম্মতের একটি দল সবসময় দ্বীনের পথে অটল থাকবে। তারা হবে বিজয়ী। শত্রুদের পরাস্থকারী। বিরোধিতাকারীরা তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা এই অবস্থায় অবিচল থাকবে, তাদের উপর আল্লাহর আদেশ (কিয়ামত) না আসা পর্যন্ত। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কোথায়? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশে।”(আহমাদ: ২২৩৭৪)

উল্লিখিত হাদীসে 'বাইতুল মুকাদ্দাস ও তার আশপাশে' বলে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড বোঝানো হয়েছে। এটা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী।

ফিলিস্তিন ইস্যু হচ্ছে আকিদার বিষয়। আর আকীদার বিষয় এমন, যা ছাড়া মুসলমান বেঁচে থাকতে পারে না। আমাদের আকিদায় আছে, দুনিয়ার যেকোনো ভূখণ্ড যখন একবার ইসলামের আলোকে শাসিত হয়, তখন সেটা ইসলামী ভূখণ্ডে পরিণত হয় যদিও তার শাসনকাল সামান্য হয়। ফিলিস্তিন ইসলামের আলোকে শাসিত হয়ে আসছে হিজরী ১৬ সন থেকে অর্থাৎ ইসলামের সূচনাকাল থেকে। কাজেই ফিলিস্তিন প্রায় চৌদ্দশ বছরেরও অধিক সময় থেকে ইসলামী ভূখণ্ড। কিয়ামত পর্যন্ত এই ভূখণ্ড আমাদের শরীয়ত ও আকিদায় ইসলামী ভূখণ্ড হিসেবেই বিবেচিত হবে। যদিও তা কখনো কখনো ব্রিটিশ, ফরাসী অথবা ইহুদী কর্তৃক শাসিত হোক, কিংবা শাসিত হোক দুনিয়ার অন্যকোনো সাম্রাজ্যের হাতে। এমনকি যদি তা কখনো কোনো কালে মুসলমানদের হাত থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায় তবুও তা ইসলামী ভূখণ্ডই বিবেচিত হবে। তবে তখন তা ইসলামের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। এটাই আমাদের আকিদা এবং এটাই আমাদের শরীয়ত। 'আল্লাহর কালিমায় কোনো পরিবর্তন নেই।'

ইসলামী ফিকহের ভাষ্যমতে, যদি কোনো ইসলামী দেশ থেকে একজন মুসলিম নারী কাফেরদের হাতে বন্দী হয়, তা হলে সেই দেশের উপর তাকে মুক্ত করে আনা ফরজ হয়ে যায়। যদি সেই দেশ তাকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর উপর তাকে মুক্ত করে আনা ওয়াজিব। যদি তারাও ব্যর্থ হয়, তাহলে প্রথমে নিকটবর্তিতার ভিত্তিতে এবং এক পর্যায়ে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়।

বর্তমানে ফিলিস্তিন দখল করে রেখেছে ইসরায়েলি হানাদার বাহিনী। তারা ফিলিস্তিনিদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের ভাই-বোনদের সংকটে আমাদের উচিত তাদের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের পবিত্র ভূমি পূর্বেও আমাদের ছিল পরেও আমাদেরই থাকবে ইন শা আল্লহ। তবে এরজন্য আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে আমাদের পূর্বপুরুষদের পথ, যেপথে হেঁটে তারা মুক্ত করেছিলেন আল আকসাকে। আল আকসাকে দখল করে ফিলিস্তিনে এখন যে সংকট চলছে তার থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আল আকসা শুধু ফিলিস্তিনিদের নয়, আকসা পুরো মুসলিম উম্মাহর প্রাণ। ফিলিস্তিনিরা আকসাকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের দায়িত্ব তো পালন করছে মাঝখানে আমরা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে কাঠগড়ায় আটকে যাচ্ছি। এখন করণীয় হলো মুসলিম উম্মাহকে এক হয়ে জিহাদ করা। ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি আল আকসাকে মুক্ত করতে বীর মুজাহিদেরা ফিলিস্তিনের বাইরে থেকে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। আমাদেরকেও সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। আমাদের আকিদা আমাদেরকে বলে আল আকসা আমাদের, ইহুদীরা দখল করে রাখলেও তা আমাদেরই। আল আকসাকে মুক্ত করা আমাদের জন্য ওয়াজিব দায়িত্ব। আমরা খালিস নিয়তে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল রেখে হিম্মত করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের বিজয় দান করবেন। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা একাধিকবার সেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُم ۡ

“হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন।”(সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত:৭)

আরও ইরশাদ করেছেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَي الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ

“হে নবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্যশীল থাকে, তারা দু’শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ’ জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কওম যারা বুঝে না।”(সূরা আনফাল, আয়াত:৬৫)
আরও ইরশাদ করেছেন,

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ

“তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন।”(সূরা তাওবা, আয়াত:১৪)

এছাড়াও এব্যাপারে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

নবী কারিম (ﷺ) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।" (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২৭৯৭)
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেছেন:

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে বের হয় এবং তার প্রাণ ও সম্পদ নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সংগ্রাম করে, তার জন্য জান্নাত নিশ্চিত।" (তিরমিজি, হাদীস:১৬৬৯)

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর পথে সংগ্রামকারী মুমিনদের সাহায্য করেন এবং তাদেরকে বিজয়ী করেন। তবে বিজয়ের শর্ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা, খালিস নিয়ত, এবং দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগ।

“আল কুদস এমন এক দুলহান,
যার মাহর আমাদের রক্ত!
মাহর পরিশোধ করা ছাড়া বিকল্প নাই।”

- হামযা বিন উসামা বিন লাদেন (হাফিজাহুল্লাহ)

তথ্যসূত্র

- ফিলিস্তিন একজন সালাহদ্দীনের অপেক্ষায় – ড. নুর আলম খলিল আল-আমিনী
- কালের বিবর্তনে ফিলিস্তিনের ইতিহাস – ড. রাগিব সারজানি
- রক্তে আঁকা ফিলিস্তিন – জসীমউদদীন আহমাদ
- ফিলিস্তিন সংকট ঐতিহাসিক পটভূমি, ভয়ংকর ভবিষ্যৎ ও আমাদের করণীয় — ডাঃ ইসরার আহমেদ রহঃ, মাওলানা সাজ্জাদ নুমানি।
- বায়তুল মাকদিস ও ফিলিস্তিনের ইতিহাস, ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র — আবু লুবাবা শাহ মনসুর।
- মাসিক আল কাউসার
- দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ।
- ঢাকা পোস্ট ডট কম।